ছবিঘরে অন্ধকার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



ছবিঘরে অন্ধকার

কল্যাণ মজুমদার

প্রিয়বরেষু

প্রৌঢ় লোকটি তাঁর রোগা লম্বা মুখখানি তুলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্থির দৃষ্টি। আমিই চোখ নামিয়ে নিলাম। একটা খটকা লাগল। চেনা? কোথায় দেখেছি? কী নাম? কিছুই মনে পড়ল না।

আবার আমি চোখ তুলতেই তিনি বললেন, কী রে, কেমন আছিস? মায়ের শরীর কেমন?

গলার আওয়াজ শুনেই চিনতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত ভাবে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম, রমেশ জ্যাঠামশাই! চিনতে পারিনি আগে। খুব রোগা হয়ে গেছেন।

উনি 'খুঁ' করে নাকের শব্দ দিয়ে হাসলেন। তার মধ্যে একটা বিদ্রূপের ভঙ্গি আছে। যেন ওঁর রোগা হওয়া বিষয়ে কথা বলে আমি একটা বোকামি করেছি। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, সত্যিই খুব বোকামি করেছি আমি।

কথা হচ্ছিল একটা পানের দোকানের সামনে। রাস্তা পেরিয়ে এসে আমি সিগারেট কিনতে চেয়েছিলাম। রমেশ জ্যাঠামশাইকে আগে চিনতে পারলেই ভালো হতো। তাহলে দূর থেকে দেখেই সটকে পড়ে অন্য সিগারেটের দোকানে চলে যেতাম। রাস্তাঘাটে এইসব গুরুজন টাইপের লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া আমার মোটেই পছন্দ হয় না। মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ টিপ করে কারুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেও বিশ্রী লাগে। অথচ আগে যাঁকে প্রণাম করেছি, অনেকদিন পর তাঁর সঙ্গে দেখা হলে প্রণাম করতেই হয়। এঁরাও আশা করে থাকেন।

সিগারেটের প্যাকেটটা চট করে পকেটে লুকিয়ে ফেললাম। অর্থাৎ একটা লুকোবার ভঙ্গি করলাম, উনি সেটা আগেই দেখেছেন। রমেশ জ্যাঠামশাই কিনলেন পাঁচটা বিড়ি। একটা বিড়ির সামনে ও পেছনে দুবার ফুঁ দিয়ে নিয়ে তারপর ধরালেন দড়ির আগুনে। আবার আমার দিকে মুখ তুলে বললেন, তোরা এখনো সেই টালিগঞ্জেই আছিস?

আমি বললাম, না, এখন গোলপার্কের দিকে উঠে এসেছি।

—নিজেরা বাড়ি করেছিস?

—না, ভাড়া বাড়ি।

—তোর দাদা তো একটা ব্যাঙ্কে— .

—হ্যাঁ।

—আর তুই?

—আমি এখনো ঠিক কোথাও—

—কতদিন যোগাযোগ নেই! তোর বাবা মারা যাবার পর তো আর—

কথা বলতে বলতে উনি হাঁটতে লাগলেন পার্কের দিকে। আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে যেতে হলো। এইসব ক্ষেত্রে মিনিট তিনেক কথা বলার পর হঠাৎ এক সময় বলতে হয়, আচ্ছা, আজ চলি, আমার একটা জরুরি কাজ আছে।

বেশি বয়স্ক আত্মীয়-স্থানীয় কারুর সঙ্গে দেখা হলে তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাড়ির প্রত্যেকের খবর নেবেনই। ইনিও আমার মা, দুই দাদা, দুই কাকা—সবার খবর আলাদা আলাদা ভাবে নিলেন, যেন এগুলি খুবই জরুরি সংবাদ। বাধ্য হয়ে তখন আমাকেও বলতেই হলো, আপনার বাড়ির সবাই কেমন আছে?

উনি আবার নাক দিয়ে সেই 'খুঁ' শব্দ করে বললেন, আছে। আছে এখনো।

পার্কটার পাশেই একটা সিনেমা হল। বহুদিন হলো এই সিনেমা হলের গেটে তালাবন্ধ। সামনে চাটাই ও মাদুর পেতে কয়েকজন লোক বসে থাকে। তাদের পেছনে একটা লাল শালুতে লেখা ২০৮ দিন অনশন। ট্রামে-বাসে যেতে যেতে এই দৃশ্যটি দেখেছি অনেকবার। লাল শালুর ওপর কাগজ সেঁটে দিনগুলো বদলে দেওয়া হয়। মনে আছে, আগের বার দেখেছিলাম, '১৯৬ দিন অবিরাম অনশন'। যতবার দেখেছি, ততবারই মনে হয়েছে, ১৯৬ দিন অবিরাম অনশন কখনো মানুষের পক্ষে সম্ভব? নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা গাঁজাখুরি ব্যাপার আছে।

রমেশ জ্যাঠামশাই আমাকে চমকে দিয়ে সেই সিনেমা হলের সামনে অনশনকারীদের পাশে বসে পড়লেন। এবং চাটাইয়ের এক কোণের ওপর হাত চাপড়ে বললেন, আয় বোস।

আমি দোনামনা করারও সুযোগ না নিয়ে বসে পড়লাম। কেননা, যারা অনশন ও ধর্মঘট করে রয়েছে, তাদের প্রতি সমর্থন জানানোই নিয়ম। আমি যে কোন অজুহাত দেখিয়ে বসতে না চাইলে, কিংবা দেরি করলে নিশ্চয়ই সবাই আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাত। হয়তো মনে করত আমি শোষক শ্রেণীর কেউ, কিংবা স্রেফ চালিয়াৎ।

কিসের জন্য ধর্মঘট বা কোন কারণে অনশন, তা আমি কিছুই জানি না। এখন আমার চেনা কেউ আমাকে দেখলে চমকে যাবে নিশ্চয়। আমি একটা সিনেমা হলের সামনের ফুটপাথে চাটাইয়ের ওপর বসে আছি। সিনেমা হলের কর্মচারীরা সম্ভবত মাইনে বাড়ানোর দাবিতে ধর্মঘটে নেমেছে। কিন্তু তাতে আমার কী আসে যায়?

রমেশ জ্যাঠামশাই পাশের কয়েকজন লোককে বললেন, ইটি আমার এক ভাইপো। লেখে-টেখে। অনেক ম্যাগাজিনে লিখেছে।

চেনাশুনো বা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ আমার লেখা-টেখার উল্লেখ করলে আমি মরমে মরে যাই। অনেকেই আমার লেখা পড়েনি। অনেকেই নাম শোনেনি। অনেকে লেখা ব্যাপারটাকে গুরুত্বই দেয় না। আমার কোন হোমরা-চোমরা আত্মীয়কে হয়তো আমার মামা বা কাকা বললেন, জানেন তো, আমাদের অমুক আজকাল লেখে। তিনি তখন সাদা মুখ করে বলেন, অ! তাই নাকি? কী লেখ তুমি?

এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। এই সব ধর্মঘটীরা কখনো ঘুণাক্ষরেও আমার নাম শোনেননি। তাঁরা কয়েকজন তাশ খেলায় ব্যস্ত ছিলেন। আমাকে একবার দেখেই বুঝলেন আমি কিছু মনোযোগের যোগ্য নই, তাই আবার চোখ ফেরালেন তাশের দিকে। শুধু একজন খানিকটা উৎসাহ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কোন পেপারে লেখেন?

ভূর্জপত্রে কিংবা শ্লেটে যে লিখি না, ফুলস্ক্যাপ সাইজ কাগজেই লিখি, একথা ওঁদের বলতে পারতাম। কিন্তু পেপার মানে ওঁদের কাছে খবরের কাগজ। সুতরাং মাথা দু'দিকে নেড়ে বললাম, না।

লোকটি অভিমানী গলায় বললেন, কোন পেপারেই আমাদের আন্দোলনের কথা ছাপালো না। কতবার নিজে গিয়ে দিয়ে এসেছি।

আমি চুপ করে রইলাম।

ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গে কোন পেপারের লোকজনের সঙ্গে চেনা নেই? দেখুন না, আমাদের খবরটা যদি একটু ছাপানো যায়—

আমি মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, আমার সঙ্গে সে-রকম চেনা নেই কারুর।

ভদ্রলোক বিশ্রীভাবে মুখ কুঁচকোলেন। নিশ্চয়ই আমাকে ভাবলেন একটা অপদার্থ। আপন মনেই বললেন, সব শালা কাগজগুলো তো আজকাল বিজ্ঞাপন দিয়েই পাতা ভরায়, খবর আর ছাপবে কী?

আমি এমন একটা মুখের ভাব করে রইলাম, যার মানে হয়, তা তো বটেই, তা তো বটেই!

কিন্তু দুশো আট দিন অনশনের রহস্যটা কী—এই লোকগুলি সবাই দুশো আট দিন না খেয়ে এখানে বসে আছে?

আমার রমেশ জ্যাঠা সমেত? তারপরও উনি হেঁটে গিয়ে দূরের দোকান থেকে বিড়ি কিনে আনলেন? এ কখনো সম্ভব?

আমি আজ দুপুরেই খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ ভাজা খেয়েছি আমার ছোট মাসীর বাড়িতে। ইলিশ মাছটার পেট ছিল ডিম ভর্তি। ইলিশ মাছের ডিম ভাজার চেয়ে সুখাদ্য এ পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ। কাস্পিয়ান সাগরের একরকম মাছের ডিমের নাম ক্যাভিয়ের। ইওরোপ-আমেরিকায় সেটা একটা দারুণ দামী ও শৌখিন খাবার। ডেলিকেসি যাকে বলে। আমি সেই ক্যাভিয়েরও খেয়ে দেখেছি। আমার মতে সেটা গঙ্গার ইলিশের ডিমের তুলনায় কিছুই নয়! আজ দুপুরে সেই ডিমের লোভে লোভে অনেকখানি খিচুড়ি খাওয়া হয়ে গেছে। ভরা পেট নিয়ে আমি বসে আছি এতগুলো ক্ষুধার্ত লোকের সঙ্গে। নিজেকে এখন আমি কী বলব? হংসদের মধ্যে বক? না বকদের মধ্যে হংস?

লোকগুলিকে আমি একবার ভালো করে দেখে নিলাম। সকলেই রোগা রোগা, সকলেরই মলিন পাঞ্জাবি ও ধুতি। পাঞ্জাবির পকেটের ধারগুলি খুব ময়লা। পকেটে হাত ঢোকাবার সময় ঐ ময়লা লাগে। অর্থাৎ এইসব লোক সাবান মাখে খুব কম। রমেশ জ্যাঠামশাইয়ের শুকনো পাকানো চেহারা। বয়েস ষাটের কাছাকাছি তো হবেই। ওঁকে শেষ দেখেছিলাম বছর দশেক আগে, যতদূর মনে পড়ছে উনি সে সময় হাওড়ায় কোন একটা কারখানায় কাজ করছিলেন। তিনি যে কবে এসে 'রোহিণী' সিনেমা হলে জুটেছেন, তা কে জানে! দুশো আট দিন অনশন? তার মানে ছ'মাসেরও বেশি? হ্যাঁ, রোহিণী সিনেমা হলটা বহুদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে ঠিকই। এতদিন এই কর্মচারীরা মাইনেও পাননি। মানুষ কতরকম আশ্চর্যভাবে বেঁচে থাকতে পারে, তাই না? তাই এসব কথা ভাবলেই গা শিরশির করে।

দুপুর পর্যন্ত আমি ছিলাম ছোট মাসীর বাড়িতে। বিকেল চারটেয় এখানে ফুটপাথে চাটাইয়ের ওপর। আজ ছোট মাসীর নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটের বসবার ঘরে একটি নতুন কার্পেট পাতা হলো। সেই উপলক্ষে আমি গিয়েছিলাম টাকা ধার চাইতে। সাতাশ শো টাকা দিয়ে যিনি কার্পেট কিনেছেন তিনি নিজের বোনপোকে পঞ্চাশটা টাকা ধার দিতে পারেন না? ছোট মাসী কিন্তু আমার প্রস্তাব শুনেই কৃত্রিম ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলেন। বললেন, দেখছিস এইসব জিনিসপত্র কিনে-টিনে এখন একেবারে হাত খালি, এর মধ্যে তুই আবার টাকা চাইছিস!

সত্যি অভাব-অনটন সকলেরই থাকে। যে কার্পেট কেনে, মোটর গাড়ি কেনে, তারও থাকে। যে এ মাসে সপরিবারে দার্জিলিং বেড়াতে যায়, পরের মাসে তাকে একটু টেনে-টুনে চালাতে হয় না? আমি তবু মুখখানা খুব কাতর করে বলেছিলাম, অন্তত চল্লিশটা টাকা ধার দাও। বিশেষ দরকার।

ছোট মাসী আমার পিঠে এক চাঁটি মেরে বললেন, ফের যদি ধার কথাটা উচ্চারণ করবি তো মার খাবি আমার কাছে। কতবার এরকম ধার নিয়েছিস?

ধার নিলে শোধ দিতে হয়, তা জানিস না? এর পর থেকে আমার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে বলবি, দান করো কিংবা ভিক্ষে দাও। তা হলে পাবি।

তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিলাম। ছোট মাসী তিরিশ টাকা দিলেন। জানতাম, ছোট মাসীর কোমল মন, উনি এর থেকে আর কমাবেন না। আমার গোটা পঁচিশেক টাকা পেলেই আজকের মতো চলে যেত। পাঁচ টাকা বেশিই পাওয়া গেল, সেই সঙ্গে খিচুড়ি আর ইলিশের ডিম ভাজা।

বিকেলবেলা আমি রমেশ জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে। বাঙালদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই এরকম বৈচিত্র্য থাকে। কোন আত্মীয় দারুণ অবস্থাপন্ন, বাড়িতে তিনখানা গাড়ি। আবার বেশ নিকট আত্মীয়ের মধ্যেই কেউ রাস্তায় বসে ছিটের জামা বিক্রি করে।

কিন্তু আমি এখানে কতক্ষণ বসে থাকব? ঠিক কোন্ কথা বলে উঠে পড়া উচিত, সেটাই মনে পড়ছে না। সিগারেট খেতে পারছি না বলেও মুখের মধ্যে একটা উসখুসে ভাব। এঁদের অনশন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে আমার ভয় করছে। আমার নিজেরই অনেক সমস্যা আছে, আবার অপরের সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় না। রমেশ জ্যাঠার শুকনো বিবর্ণ মুখখানার দিকে আমি ভালো করে তাকাতে পারছি না পর্যন্ত। কয়েকজন অনশনকারী অবশ্য বেশ উৎসাহের সঙ্গেই তাশ খেলে চলেছেন।

রমেশ জ্যাঠা জিজ্ঞেস করলেন, তুই এদিকে কোথায় যাচ্ছিলি?

—শিয়ালদায়।

—শিয়ালদায়? ট্রেনে কোথাও যাবি?

আমি খুব নরম করে মিষ্টি সুরে বললাম, নৈহাটিতে আমার এক বন্ধু থাকে —তার কাছে যাবার কথা।

রমেশ জ্যাঠা ব্যস্ত হয়ে বললেন, তা হলে তোর ট্রেনের লেট হয়ে যাবে না? বসে আছিস কেন—একথা আগে বলতে হয়! তুই যা—

আমি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে সকলের দিকে আলতোভাবে নমস্কার জানিয়ে এগিয়ে গেলাম। প্রথমে একটু ধীরভাবে হেঁটে তারপর গতি বাড়িয়ে দিলাম। খানিকটা দূরে গিয়ে পেছন ফিরে দেখলাম আর একবার।

রাস্তা দিয়ে অন্যান্য যে-সমস্ত মানুষজন যাচ্ছে, তারাও ঐ ফুটপাথের চাটাইয়ের ওপর বসে থাকা রোগা-রোগা লোকগুলিকে দেখে যাচ্ছে দু-এক পলক। ভুরুর ভঙ্গিতে সামান্য কৌতূহল, তার বেশি কিছু না।

খুব ছোটখাটো মিথ্যে কথায় তেমন দোষ হয় না। নৈহাটিতে আমার যাবার

কথা নেই। ট্রেনে করে কোথাও যাব না। কিন্তু এর চেয়ে আর ভালো ছুতো কী দেখাতে পারতাম? ফুটপাথে আমি অনেকবার অনেক জায়গায় বসেছি। আর ধর্মঘটীদের সঙ্গে বসে থাকার মধ্যে খানিকটা গর্বের ব্যাপার থাকে। বেশ একটা মহৎ-মহৎ ভাব আসতে পারে। কিন্তু আমার ভরা পেট আর ঐ লোকগুলি বহুদিন না খেয়ে আছে, এজন্যই দারুণ অস্বস্তি লাগছিল। একজন নর্দমার মধ্যে পড়ে-যাওয়া লোক যদি ধোপ-দুরস্ত কাপড় পরা একজন লোককে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে, তাহলে যেমন হয়। তবে, কে নর্দমার মধ্যে পড়ে-যাওয়া লোক? ওরা, না আমি? সেটা ঠিক করা শক্ত।

কিন্তু দুশো আট দিন অনশন করে থাকা একটা গাঁজাখুরি ব্যাপার নয়? বিপ্লবী যতীন দাস জেলখানার মধ্যে বাষট্টি না তেষট্টি দিন যেন অনশন করে মারা গিয়েছিলেন। সেটা একটা ইতিহাস হয়ে আছে। দুশো আটদিন না খেয়েও যদি বেঁচে থাকা যায়, তাহলে আর খাদ্যের জন্য এত পরিশ্রম করে লাভ কী?

শিয়ালদার ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে একটু পরে আমি একটা বাসে উঠে পড়লাম।

এরপর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করা, আড্ডা, বইয়ের দোকানের ধার শোধ দেওয়া ইত্যাদিতে জড়িত হয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়ছিল। দু'শো আট দিন। দু'শো আট দিন.....। বেশ একটা খটকার ব্যাপার।

রাত্রে বাড়ি ফিরে মাকে বললাম, তোমার রমেশ জ্যাঠাকে মনে আছে?

মা প্রথমটায় চিনতে পারলেন না। তারপর বর্ণনা দিতে বুঝলেন। বললেন, ও, কোথায় দেখা হলো?

সব ঘটনার বিবরণ শুনে মা কিন্তু একটুও সহানুভূতি দেখালেন না। বরং চটে উঠলেন দারুণভাবে। ধমকের সুরে বললেন, ওঁর কী আক্কেল? তোকেও বসতে বললেন ঐ রাস্তার মাঝখানে?

আমি বললাম, যাক গে, তাতে এমন কিছু হয়নি।

মা বললেন, হয়নি মানে? ভদ্রলোকের ছেলে রাস্তায় বসতে যাবে কেন? হাজার লোকের পায়ের ধুলো।

—চাটাই পাতা ছিল, মা। আর যারা ছিল, তারাও তো ভদ্রলোক। আজকাল তো অনেকেই রাস্তায় বসে ধর্না দেয়।

—সে যারা দেয় তারা দিক। ওরা ধর্মঘট-মর্মঘট যা খুশি করুক, তার সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক? যতসব অলক্ষুণে ব্যাপার। যা, ভালো করে চান করে আয়।

কিছু লোক যে দুশো আট দিন না খেয়ে আছে, সেকথা শুনেও মায়ের মনে একটুও দাগ কাটল না। এমনকি রমেশ জ্যাঠার কথাটাতেও গুরুত্ব দিলেন না।

তিনি প্রথমেই নিজের ছেলের মঙ্গল-অমঙ্গলের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মাতৃস্নেহ জিনিসটা এই রকম।

মায়ের মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা করবার জন্য আমি একটু কথা ঘুরিয়ে বললাম, আচ্ছা মা, ভাবতে পারো, ওঁরা দুশো আট দিন না খেয়ে আছেন!

মা এতেও বিচলিত না হয়ে বললেন, বাজে কথা। অতদিন কেউ না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে? কেতকীর বাবার কোন কথা আমি বিশ্বাস করি না। ওনাকে চিনি ভালো করে, সারাজীবন ধরে মিথ্যে কথা বলে আসছেন।

—উনি একলা নন। দশ-বারো জন লোক। সবাই তো আর মিথ্যে কথা বলবেন না।

—নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে খায়।

—টাকাই বা পাবে কোথায়? দুশো আট দিন ধরে তো মাইনেও পায়নি।

মা এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সরমার কপালটাই খারাপ। এমন একটা মানুষের হাতে পড়েছে, সারা জীবন একটুও সুখ পেল না। কেতকীর বাপটা তো বরাবরই উড়নচণ্ডী।

রমেশ জ্যাঠার সঙ্গে আমাদের কোন রক্তের সম্পর্ক নেই। উনি আমার বাবার পিসিমার সৎ ছেলে। খুব অল্প বয়েসে নিজের মাকে হারান। বাবার পিসিমাই ওঁকে মানুষ করেছিলেন। এক সময় উনি আমাদের বাড়িতে খুব আসতেন। তাশ খেলতেন বাবার সঙ্গে। আমার বাবার থেকে বয়েসে বড় হলেও রমেশ জ্যাঠা বেশ সমীহ করে চলতেন আমার বাবাকে। বেশ মনে আছে, উনি এলে আমরা খুব বিরক্ত হতাম। এক একদিন সকালে এসে রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত থাকতেন। বাবা বাড়িতে না থাকলেও অপেক্ষা করতেন তাঁর জন্য। ফলে, আমাদের বসবার ঘরটা সারাক্ষণ জোড়া থাকত, আমাদের বন্ধু-বান্ধব এলেও বসাতে পারতাম না। জ্যাঠামশাই সম্পর্কের কারুর সামনে তো আর বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করা যায় না!

দূর সম্পর্কের ভাসুর হলেও মা ওঁর নাম মুখে আনতেন না। সেইজন্য কখনো কেতকীর বাবা, কখনো সরমার বর বলে উল্লেখ করছেন। তখন আমার ক্ষীণভাবে মনে পড়ল, কেতকী নামের মেয়েটিকে আমি দু-একবার দেখেছি। কোন উপলক্ষে রমেশ জ্যাঠা সপরিবারে নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা। তার মধ্যে কেতকী নামের মেয়েটি ছিল আমারই বয়েসী। আমার তখন দশ-এগারো বছর বয়েস। মনে আছে, ছাদে খুব দৌড়াদৌড়ির খেলা খেলেছিলাম কেতকীর সঙ্গে। কালো রঙের বেশ মোটকা-সোটকা মেয়েটা।

রাত্তিরবেলা খেতে বসে রমেশ জ্যাঠা সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জানতে

পারলাম মায়ের কাছে। আমার দাদাও অনেক কিছু জানেন। দাদা তো বেশি বয়স পর্যন্ত দেখেছেন ওঁকে।

আমার দাদা একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। সুতরাং বেশ অফিসার-সুলভ হাবভাব। মেজদা আবার হাসি-ঠাট্টা ভালোবাসেন কথায় কথায়। কলেজে পড়ান মেজদা। বাড়ির মধ্যে আমিই বেকার। এমনকি, দাদার ছেলে বিল্টু পর্যন্ত ডাক্তারি ক্লাসে সদ্য ভর্তি হয়েছে, তাকেও চাকরির চিন্তা করতে হবে না।

খাওয়ার টেবিলে চারটি মাত্র চেয়ার বলে আমরা পুরুষরা এক সঙ্গে খেতে বসি, বৌদিরা পরিবেশন করেন। তাছাড়া, বাঙাল বাড়িতে শাশুড়ির সামনে ছেলে আর বৌদের একসঙ্গে খেতে বসার রেওয়াজ এখনো তেমন চালু হয়নি। বিশেষত শাশুড়ি যদি তেমন জাঁদরেল হন। আমার মায়ের সামনে আমার বৌদিরা একটু উঁচু গলায় কথা বলতে পারেন না পর্যন্ত।

দাদা বললেন, রমেশ জ্যাঠা শেষ পর্যন্ত সিনেমা হলের চাকরি নিয়েছিলেন? হুঁ! কত ভালো ভালো চাকরি আগে জুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাবাই তো ওঁকে একবার মার্টিন বার্নে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন একজনকে বলে-কয়ে। সে চাকরিও উনি রাখতে পারলেন না।

মেজদা বলল, উনি নিশ্চয়ই রোজ রোজ সিনেমা দেখার লোভে ঐ চাকরিটা নিয়েছিলেন। আমি একসময় দেখতাম, উনি প্রায়ই সিনেমা হলের সামনে দশ আনার লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন! কলেজ থেকে আমরা যখন মেট্রো সিনেমায় যেতাম দশ আনার লাইনে, ঠিক দেখতাম রমেশ জ্যাঠা দাঁড়িয়ে আছেন একেবারে প্রথমে।

মা বললেন, দূর দূর! ও চাকরিতে কতই বা মাইনে, অতগুলো ছেলেপুলের সংসার চালায় কি করে?

দাদা বললেন, যাদের সংসারে টানাটানি থাকে, যারা ভালো চাকরি-বাকরি করে না, তাদেরই ছেলেপুলে বেশি হয়। এটা ভগবানের একটা বিচিত্র খেয়াল।

মেজদা টেবিলে তবলা বাজানো থামিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে বেচারা ভগবানকে দোষ দিচ্ছ কেন? গরীবদের বেশি ছেলেপুলে হবার তো সামাজিক কারণই রয়েছে।

মা বললেন, মেয়েই তো বোধহয় গোটা চারেক। একটা ছেলেও আছে, কিন্তু সেটা তো মানুষ হয়নি শুনেছি। গোল্লায় গেছে। ছেলেটা নীলুরই বয়েসী হবে বোধহয়।

মেজদা বলল, আমার কাছ থেকে রমেশ জ্যাঠা একবার দু'টাকা ধার

নিয়েছিলেন। ফেরত দেননি। তখন আমি কলেজে পড়ি, দু'টাকার অনেক দাম।

দাদা মুখ তুলে তাকালেন মেজদার দিকে। তারপর দুর্লভ একটু হাসি দিয়ে বললেন, আমার কাছ থেকে কয়েকবারে মিলিয়ে অন্তত গোটা পঞ্চাশেক টাকা নিয়েছেন। ধার করার ব্যাপারে রমেশ জ্যাঠার ছোটবড়'র ভেদাভেদ ছিল না কখনো।

মা বললেন, কেন দিয়েছিলি? আর কক্ষনো দিবি না।

দাদা বললেন, অনেকদিন আগে, অন্তত বছর দশেক হবে।

মা বললেন, ঐ তো বদ স্বভাব মানুষটার। চারদিকে ধার করে বেড়ায়। তোর বাবার কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছে কে জানে!

মেজদা বলল, বাবার একটা সফট কর্নার ছিল ওঁর সম্পর্কে। আমি দেখেছি, যারা লুজার, যারা ভাগ্যের হাতে অনেক মার খেয়েছে, বারবার হেরে গেছে, সেই ধরনের লোকদের সম্পর্কে বাবার খানিকটা দুর্বলতা ছিল।

মা দাদার পাতে খানিকটা ছোলার ডাল দিয়ে বললেন, আর একটু ভাত নে। দেব, একটু ভাত?

দাদা হাত তুলে নিষেধ করলেন।

মেজদা বলল, আমাকে আর একটু ফুলকপির তরকারি দাও তো। বেশ হয়েছে এটা।

দাদা বললেন, এক সময় রমেশ জ্যাঠার অনেক টাকা ছিল, সব নষ্ট করেছেন। মামাদের সম্পত্তি পেয়েছিলেন, কোন্নগরে একটা বাড়ি ছিল। সব বিক্রি করে দিয়ে ব্যবসা করতে গেলেন। আমার বেশ মনে আছে, বৌবাজারে রমেশ জ্যাঠা একটা ক্যামেরা-ট্যামেরার দোকান খুলেছিলেন, কয়েকবার গেছি সেখানে, আমার তখন পনেরো-ষোলো বছর বয়স।

মেজদা বলল, আমিও গেছি।

দাদা বললেন, তুই তখন অনেক ছোট, তোর মনে থাকবার কথা নয়।

মেজদা বলল, হ্যাঁ, মনে আছে, দুদিনেই তো সে দোকান লাটে উঠে গেল।

মা বললেন, সরমা অতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে কী করে চালাচ্ছে, কে জানে। মেয়েটার কপালটাই খারাপ।

দাদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, রমেশ জ্যাঠাও অনশন করেছেন?

আমি বললাম, তাই তো দেখলাম। দুশো আট দিন।

মেজদা বলল, ঐ তো সামান্য চাকরি। ওর জন্য আবার অনশন। অন্য চাকরি খুঁজলেই পারেন!

দাদা বললেন, কে ওঁকে চাকরি দেবে? শুধু তো ম্যাট্রিক পাশ। তাছাড়া বয়েসও তো কম হলো না।

রমেশ জ্যাঠার বয়েস কত? বাবা বেঁচে থাকলে তাঁর এখন বয়েস হতো আটষট্টি। রমেশ জ্যাঠা বাবার চেয়ে মাত্র দেড় বছরের বড়ো, তাহলে প্রায় সত্তর বছর বয়েস? চেহারা দেখলে কিন্তু অতটা বোঝা যায় না। সত্তর বছর? ওরে বাবা, এই বয়েসে তো সবাই চাকরি থেকে রিটায়ার করে যায়।

রমেশ জ্যাঠার প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল মাছের মুড়ো এসে পড়ায়। বড় মাছ বাড়িতে রোজ আসে না। যেদিন আসে, সেদিন মুড়োটা কাকে দেওয়া হবে, সে ব্যাপারে একটা সুনির্দিষ্ট হিসেব আছে।

আমাদের বাড়িতে বড় মাছের মুড়ো কক্ষনো দু'ভাগ করা হয় না। আস্তই থাকে। এবং সেই আস্ত মুড়োটি দেওয়া হবে বাড়ির কোন না কোন পুরুষকে। এটাও বাঙাল বাড়ির প্রথা! মেয়েদের মধ্যে মুড়ো খেতে কেউ ভালোবাসে কিনা, সেকথা কোনদিন কেউ জিজ্ঞেস করেও দেখে না। মাছের মুড়োর ব্যাপারে যেন শুধু পুরুষদেরই ক্রমাগত অধিকার।

আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে দাদাকেই বেশি ভালোবাসেন মা। প্রথম সন্তানের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব তিনি লুকোতেও পারেন না। মা মাছের মুড়োটা দাদার দিকে এগিয়ে দিতেই দাদা বললেন, আমাকে কেন?

মেজদা সব কিছুর হিসেব রাখে। মেজদা বলল, এর আগের দিন কে খেয়েছিল? গত সোমবার...ও, আমিই তো খেয়েছিলাম। আজ নীলুর।

আমি বললাম, থাক, আমার আজ চাই না। আজ বরং বিল্টুকে দাও।

বিল্টু খাবার টেবিলে বসে বই পড়ে। আজও সে এতক্ষণ একটা বইতে মগ্ন ছিল, আমাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেনি। এবার সে মুখ তুলে বলল, না, আমি আজ মুড়ো খাব না। আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

বিল্টু আসলে মুড়ো খেতে ভালোবাসে খুব। লজ্জা পাচ্ছে। আমি বললাম, খা না বিল্টু। আমি আজ ছোট মাসীর ওখানে ইলিশ মাছটাছ অনেক খেয়েছি—

বিল্টু বলল, না, আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

মা মাছের মুড়োটা হাতায় তুলে রেখেছিলেন, এবার সেটা আবার দাদার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, তুই-ই নে, ওরা যখন কেউ চাইছে না।

দাদা গম্ভীরভাবে বললেন, না, নীলুকেই দাও।

বাবা মারা যাবার পর দাদাই এখন হেড অব দা ফ্যামিলি। তাঁর ভারিক্কী চালচলন দেখে সবাইকে সমীহ করতে হয়। এমনকি মা-ও দাদার কথা অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

মেজদা মিটিমিটি হাসছে। কারণ, তাকে একবারও অনুরোধ করল না কেউ। মা মুড়োটা আমার পাতে ফেলে দিলেন।

আমার একটু গুরুভোজনই হয়ে গেল। ও বেলা খিচুড়ি, মাছ ভাজা, ইলিশ মাছের ডিম, আবার এবেলা এতবড় মুড়ো—

মুড়োটা ভেঙে, কিছুক্ষণ পর ভেতরের ঘিলুটা চুষতে চুষতে হঠাৎ আমার আবার মনে পড়ল রমেশ জ্যাঠার কথা। দুশো আট দিন অনশন? দুশো আট দিন! একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার।

২

রমেশ জ্যাঠাকে নিয়ে কিছু লেখার প্রশ্নই আসত না, যদি না এরপর আর একটি বিচিত্র যোগাযোগ ঘটত। সেটাই একটু সবিস্তারে বলতে হবে। রীতিমত নাটকীয় ব্যাপার।

এর দু'দিন বাদেই আমার বন্ধু দেবরাজের সঙ্গে আমি একটা অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম। দেবরাজের নেশা ছিল দুর্লভ বই সংগ্রহ করা। এখন সেটাই পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে সে পুরোনো দুষ্প্রাপ্য বই খুঁজে আনে। পণ্ডিত, গবেষক বা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলো বেশ ভালো দামে কিনে নেয়। দেবরাজ খবর রাখে কোথায় কোথায় পাওয়া যায় এরকম বই। এই বই-সংগ্রহ অভিযানে বেরিয়ে নানা রকম উত্তেজক অ্যাডভেঞ্চারও হয় প্রায়ই। আমি সঙ্গে যাই সেই লোভে।

পুরোনো আমলের রাজা-মহারাজা বা জমিদার বাড়িগুলোতে অযত্নে অনাদরে এরকম বহু বই পড়ে আছে। কোন এক সময়, কোন বইপ্রেমিক রাজা বা জমিদার শখ করে বই কিনে বানিয়েছিলেন লাইব্রেরি, বর্তমান বংশধররা সেসব বইয়ের খোঁজও রাখে না। অবহেলায় ফেলে রাখা সেইসব বই উইপোকায় কাটে। আমরা সেইসব বাড়িতে হানা দিই। টাকা দিয়ে কিনে অথবা মিথ্যে কথা বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অথবা তাতেও না হলে চুরি করে সেই সব বই আমাদের আনা চাই-ই। এজন্য আমাদের বিবেক-দংশন হয় না। কারণ, বই জিনিসটা এমনই যা অযত্নে ফেলে রাখার চেয়ে আগ্রহী পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া একটা পবিত্র কাজ।

এবার আমরা গেলাম পূর্ণিয়ায়। দেবরাজ আগে থেকেই গুপ্তচর মারফত খবর পেয়েছিল যে পূর্ণিয়ায় এক জমিদার বাড়িতে কিছু অত্যন্ত দামী বই আছে। অনেক রাজা-মহারাজার বাড়িতে গিয়ে আমাদের দারুণ দারুণ মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে

এর আগে। হয়তো গ্রামের মধ্যে এক রাজবাড়িতে গেছি। এককালের বিশাল এক প্রাসাদ এখন ভাঙাচুরো। বাড়ির সামনেই একটা পুকুরে একজন রোগা মতন লোক মাছ ধরার জন্য ছিপ ফেলে আছে আর বিড়ি টানছে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, বর্তমান রাজার সঙ্গে কখন দেখা হবে বলতে পারেন? লোকটি বিড়ি ফেলে দিয়ে বলল, আমিই রাজা। কী চাই, বলুন?

আর একজন প্রৌঢ় রাজাকে দেখেছিলাম সাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াতে। এককালে তাঁদের হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া ছিল।

পূর্ণিয়ার জমিদারকেও আমরা বিশেষ পাত্তা দিইনি। জমিদারী ঘুচে গেছে বহুদিন, এখন আর রবরবা নেই। এঁরা অনেকেই এখন আগ্রহের সঙ্গে বই বিক্রি করে দেন।

ভাট্টা বাজারে একটা হোটেলে উঠে আমরা আমাদের স্ট্রাটেজি ঠিক করে নিলাম। প্রথমে কিনতে চাইব। তাতে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে বাড়ির কোন চাকর-বাকরকে হাত করে চুরির ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা শুনেছিলাম, বর্তমান জমিদারের নাম অ্যালবার্ট। সে আবার একটি কী রকম প্রাণী হবে কে জানে।

পরদিন সকালে স্থানীয় লোকজনের কাছে অ্যালবার্টের খোঁজ করতেই অনেকে একটা মোটর গ্যারেজ দেখিয়ে দিল। সেখানে একটা ট্রাকের তলায় শুয়ে পড়ে একজন মিস্ত্রি কাজ করছিল, আমাদের কথা শুনে একটু বাদে সে বেরিয়ে এল। তার নামই অ্যালবার্ট। সারা গায়ে তেল-কালি লেগে আছে যদিও, তবু তাকে দেখে বোঝা যায়, খাঁটি সাহেবী রক্ত আছে তার গায়। মাথার চুল লালচে। সে আমাদের হিন্দীতে জিজ্ঞেস করল, কী চাই?

আমরা বললাম, আপনার সঙ্গে একটা-দুটো বইয়ের ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছি।

'বই', বলে লোকটি এমন ভাবে তাকাল যেন ঐ শব্দটা সে প্রথম শুনছে। সাহেবদের মতন চেহারা হলেও সে ইংরেজি ভালো বুঝতে পারে না।

একটুক্ষণ কথা বলেই নিরাশ হতে হলো আমাদের। আমাদের খবরে একটু ভুল ছিল। অ্যালবার্ট হচ্ছে আগেকার জমিদারের মেম-রক্ষিতার ছেলে। সম্পত্তির কোন ভাগই সে পায়নি। কোন ক্রমে এই মোটর গ্যারেজ করে পেট চালায়। বর্তমান উত্তরাধিকারীর নাম তেজেন্দ্রনারায়ণ সিং। সে-ই সব কিছুর মালিক।

নাম শুনে মনে হয়েছিল কোন গোঁফওয়ালা মোটকা-সোটকা লোক হবে। জমিদার বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলো তাঁর সেক্রেটারি মারফত। নিখুঁত স্যুট-টাই পরা ছিমছাম চেহারার একজন ভদ্রলোক সেই তেজেন্দ্রনারায়ণ সিং। কথা বললেন ইংরেজিতে, মার্কিন উচ্চারণে। এই সব লোকের কাছ থেকে

ভুলিয়ে-ভালিয়ে বই আদায় করা খুব শক্ত।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কী ব্যাপারে এসেছেন?

জমিদার বাড়ির ঝকমকে চেহারা দেখেই বুঝেছি, এখনও এঁদের বেশ পয়সাকড়ি আছে। লেখাপড়ারও চর্চা আছে এ বাড়িতে। সুতরাং এখানে বই কেনার প্রস্তাব দেওয়া যাবে না।

আমরা এজন্যও আগে থেকেই তৈরি হয়ে এসেছিলাম। একটা দুষ্প্রাপ্য ইতিহাসের বইয়ের নাম বলে আমরা জানালাম যে, আমরা দুজনেই ইতিহাস নিয়ে রিসার্চ করছি। আপনার লাইব্রেরিতে এ বইখানা যদি একটু দেখতে দেন।

তেজেন্দ্রনারায়ণ ভুরু কুঁচকে বললেন, ঐ বইখানা দেখবার জন্য আপনারা কলকাতা থেকে এত দূর এসেছেন? আমার লাইব্রেরিতে ঐ বইটা আছে, কে বলল আপনাদের?

বললাম, পূর্ণিয়ারই এক ইতিহাসের অধ্যাপক একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন।

কিন্তু ঐ বইটার তো আরো দুটো কপি এদেশে পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটা আছে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। সেখানে বইটা না দেখে আপনারা এত দূর এলেন কেন?

বাবাঃ, এ দেখছি অনেক কিছু জানে। আমাদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে।

তক্ষুনি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, কলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ঐ বইটা আছে আমরা জানি। কিন্তু সেটা দ্বিতীয় সংস্করণ। আপনাদের কাছে আছে প্রথম সংস্করণ, সেটাই একটু দেখতে চাই।

তেজেন্দ্রনারায়ণ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমাদের দিকে। তারপর মৃদু হেসে বললেন, আপনাদের উৎসাহ দেখে খুশি হলাম। আজকাল এইসব বইয়ের খোঁজ-খবর বিশেষ কেউ রাখে না। তবে, ঐ বইটা আপাতত আমার এখানে নেই। আমার স্ত্রীর খুব উৎসাহ আছে ইতিহাসে। আমার স্ত্রী বছরে তিন-চার মাস দার্জিলিং-এ থাকেন। অনেক বইপত্র, বিশেষত ইতিহাসের বইগুলো সেখানে নিয়ে গিয়ে সাজিয়েছেন।

আমরা নিরাশ হচ্ছিলাম, কিন্তু তেজেন্দ্রনারায়ণ এর পরের কথাটিতে আমাদের চমৎকৃত করে দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা উঠেছেন কোথায়?

আমরা হোটেলের নাম বললাম।

তিনি বললেন, ইঃ, ঐ নোংরা হোটেলে! আপনারা এক কাজ করুন, আপনারা

আমার গেস্ট-হাউসে এসে থাকুন। কালই আমি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি দার্জিলিং, আপনারা চলুন আমার সঙ্গে।

আমি আর দেবরাজ চোখাচোখি করলাম। দার্জিলিং বেড়াবার এটা একটা চমৎকার সুযোগ বটে, কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য এতে সফল হবে না।

দেবরাজ বলল, না থাক। আমরা আপনাদের এতটা বিরক্ত করতে চাই না।

তেজেন্দ্রনারায়ণ বললেন, না, না, চলুন, কোনো অসুবিধে নেই। আপনারা একটা বই দেখতে চেয়েছেন—কেউ তো আর এরকম উদ্দেশ্য নিয়ে আসে না। বইটা যখন আমাদের রয়েছে, তখন দেখবেন না কেন?

তাঁর পেড়াপিড়িতে আমাদের থেকে যেতেই হলো। রাজবাড়ির অতিথি আমরা, দারুণ খাতির-যত্ন, বিকেলবেলা তেজেন্দ্রনারায়ণ আমাদের তাঁর গাড়িতে করে জঙ্গলের দিকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। এদিককারই কোন জঙ্গল নিয়ে বিভূতিভূষণ 'আরণ্যক' লিখেছেন।

জমিদারি উচ্ছেদ হয়ে গেলেও তেজেন্দ্রনারায়ণ সিং যথেষ্ট ধনী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে তাঁর বাড়ি আছে। এছাড়া তিনি বেশ কয়েকটি চা-বাগানের মালিক। মানুষটি বেশ ভদ্র এবং রুচিবান।

পরদিন ভোরে গাড়িতে চেপে আমরা রাত্রের মধ্যে দার্জিলিং পৌঁছে গেলাম। ওঁদের বাড়িটা দার্জিলিং শহরের একটু আগে, ঘুম-এর কাছাকাছি। এ বাড়িটাও চমৎকার। আটখানা ঘর। তার মধ্যে আমাদের জন্য দেওয়া হলো যে-ঘরটি, সেটা থেকে নাকি পরিষ্কার দিনে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়।

তেজেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী সহাস্যে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। খুব সম্ভব ইনি ওঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বয়েসের তফাৎ অনেকখানি। হালকা ছিপছিপে চেহারার এক তরুণী, চোখে-মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। এঁর নাম শান্তা। যদিও উত্তরপ্রদেশের মেয়ে, তবু বেশ ভালো বাংলা বলতে পারেন, কারণ শান্তিনিকেতনে দু'বছর পড়েছেন।

তেজেন্দ্রনারায়ণও ভালোই জানেন বাংলা। কারণ কাজের জন্য ওঁকে প্রায়ই কলকাতায় আসতে হয়। তাছাড়া পূর্ণিয়ার লোকের কাছে বাংলাটা খুব দূরের ভাষা নয়।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বললেন যে, আমরা ওখানে যতদিন খুশি থেকে লাইব্রেরিতে পড়াশুনো করতে পারি। শান্তার একদম গরম সহ্য হয় না বলে মে মাস থেকে আগস্ট পর্যন্ত দার্জিলিং-এর এই বাড়িতে থাকেন। এখানে অনেক বই আছে।

রাত্তিরবেলা এমন বিপুল খাওয়া-দাওয়া হলো যে মনে হলো, তিন চারদিন যদি এখানে থাকি, তাহলে খেতে খেতেই মরে যাব। দেবরাজ অবশ্য বেশ

ভোজনরসিক, কিন্তু সে-ও তিনরকম মাছ-মাংসের পর চার রকম মিষ্টি খেয়ে বলল, আর পারছি না।

এঁরা আমাদের ইতিহাসের গবেষক বলে খাতির করছেন, কিন্তু আসলে আমরা বই-চোর। সেজন্য একটু কিন্তু-কিন্তু বোধ করছিলাম। যদিও আমাদের মুখ চোখ দেখে কেউ আমাদের চোর বলে সন্দেহ করবে না।

পরদিন সকাল থেকেই আমরা মনোযোগী ছাত্রের মতন লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনোয় লেগে গেলাম। ইতিহাসের সেই দুর্লভ বইটি হাতে নিয়ে দেবরাজের চোখে প্রায় জল এসে গেল। সে বুঝে গেছে, এই বইটা কিছুতেই এখান থেকে সরানো যাবে না।

কিন্তু চোর কখনো সম্পূর্ণ সাধু হয়ে যেতে পারে না একদিনে। লাইব্রেরিতে হাণ্টার সাহেবের খুব পুরোনো দু'খানা গেজেটিয়ার দেখে দেবরাজ আর লোভ সামলাতে পারল না। আমাকে কানে কানে ফিসফিস করে বলল, এই দু'খানা নিতেই হবে রে নীল্।

দুটো দিন সে বাড়িতে আমরা চমৎকার আনন্দে কাটিয়ে দিলাম। সকালে কয়েক ঘণ্টা আমরা পড়াশুনোর ভান করি। তারপরই দুপুরে এলাহি খাওয়া-দাওয়া। তারপরে লাইব্রেরিতে দরজা বন্ধ করে ঘুমোই। বিকেল থেকে শুরু হয় আড্ডা। তেজেন্দ্রনারায়ণ একটু গম্ভীর প্রকৃতির হলেও শান্তা অজস্র কথা বলে। আমাদের সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গেছে। আমাদের একটাও পয়সা খরচ হয় না, পরের বাড়িতে তোফা খাতির-যত্ন পাচ্ছি।

বাড়ির সামনের বারান্দাটা সত্যি অপূর্ব। সামনে বহুদূর পর্যন্ত ঢালু উপত্যকা। বিরাট বিরাট পাইন গাছ মাথা উঁচু করে স্বর্গ ছুঁতে চাইছে। আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসে বিকেলের আলো। হঠাৎ হঠাৎ কুয়াশা বা উড়ো মেঘ এসে ঢেকে দেয় আমাদের। তার মধ্যে শান্তা চায়ের কাপে যখন চিনি মেশায়, তখন চামচের শব্দটা সঙ্গীত হয়ে যায়।

দার্জিলিং-এর বাড়ি, তেজেন্দ্রনারায়ণ আর তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী স্ত্রী আর আমরা দু'জন চোর—এই নিয়ে একটা রোমহর্ষক উপন্যাস লেখা যেতে পারত। চমৎকার পরিবেশ, পাত্র-পাত্রীরাও বেশ উৎকৃষ্ট। কিন্তু এটা অন্য গল্প।

তৃতীয় দিন বিকেলে আমরা বেড়াতে গেলাম ম্যাল-এ। আমার বেশ কয়েক বছর পর দার্জিলিং-এ আসা। রীতিমত ঘিঞ্জি হয়ে গেছে শহরটা। এখন গরমকাল বলে, দু-চার পা হাঁটলেই কলকাতার কোন-না-কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

আমাদেরও সেরকম হলো। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ একজন আমার পিঠে

চাপড় মেরে বলল, কী রে নীলু! শ্রীমান নীললোহিত, দার্জিলিং-এ কী করছিস?

তাকিয়ে দেখলাম, সুজিত। কলেজে আমার সহপাঠী ছিল। সে আমার মতন বেকার নয়, তার বাবার মেডিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেস-এর ব্যবসা আছে। শুনেছি, কিছুদিন আগে সে একটি বেশ বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করেছে। সে বিয়েতে আমি নেমন্তন্ন পেয়েও যাইনি। বিয়েবাড়িতে গেলেই উপহার-টুপহার দেবার ঝামেলা থাকে।

—আয়, আলাপ করিয়ে দিই।

সুজিতের সঙ্গে অনেকে রয়েছে। চারজন মেয়ে, যাদের বয়েস তেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে, প্রত্যেকের মুখের ধাঁচ অনেকটা এক রকম। চারজনই ফর্সা এবং সুন্দরী। দেখলেই বোঝা যায় ওরা সহোদরা। সবচেয়ে ছোটটি পরেছে স্কার্ট, মাঝখানের দু'জন ফ্লেয়ার, বড়টি শাড়ি। সুজিতও খুব সাজগোজ করে আছে, যাকে বলে হেভি মাঞ্জা। ওর টকটকে লাল রঙের ফুল হাতা সোয়েটারটা নিশ্চয়ই ইম্পোর্টেড।

বড় মেয়েটির নাম সুজাতা। তার ফাঁপানো চুলের মধ্যে সিঁদুরের রেখা অদৃশ্য হলেও সে-ই সুজিতের স্ত্রী। বাকি তিনজনের মধ্যে দু'জনের নাম আমি ভুলে গেলাম, কিন্তু অন্য জনের নাম আমার মনে গেঁথে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তার নাম বিশাখা। সে বলল, ও, আপনিই নীললোহিত! আপনার লেখা আমি পড়েছি, সেই যে কাশ্মীরে এক ভদ্রমহিলার স্বামী হারিয়ে গিয়েছিল...।

আমার লেখার কেউ প্রশংসা করলে আমি একেবারে গদগদ হয়ে পড়ি, মুখখানা বিনীত হতে হতে বোকা-বোকা হয়ে যায়, মাথা নিচু হয়ে আসে। আর, কোন মেয়ের মুখ থেকে প্রশংসা শুনলে তো কথাই নেই। অবশ্য জীবনে একবার বা দেড়বারই এরকম শুনেছি।

আমার মনে হলো, বিশাখা মেয়েটি স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক দেবদূতী। কী সরল আর সুন্দর তার মুখখানা ইত্যাদি। আমি যখন নিজেকে নিয়ে এইভাবে ব্যস্ত তার মধ্যে দেবরাজ অনেকখানি ভাব জমিয়ে ফেলেছে সুজিতের সঙ্গে।

সুজিত আমাকে উদ্দেশ করে বলল, তোরা কোন হোটেলে উঠেছিস? ইচ্ছে করলে আমাদের ওখানে এসে থাকতে পারিস। অনেক জায়গা আছে। আমার শ্বশুরের একটা বাড়ি আছে এখানে। পাঁচখানা ঘর।

সুজিতটা বরাবরই এরকম চালিয়াৎ। আমাদের অন্যরকম ভাবে আমন্ত্রণ করা যেত না? পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই জানিয়ে দিতে হবে যে ওর শ্বশুরের বাড়ি আছে দার্জিলিং-এ? ওর শ্বশুর-ভাগ্য এবং শ্যালিকা-ভাগ্য বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে।

ইচ্ছে হলো আমিও একটু চাল মেরে বলি, আমরা কোন হোটেলে উঠিনি, উঠেছি এক রাজার বাড়িতে, সেখানে আটখানা ঘর, সেখানেও এক অতি সুন্দরী রানী খুব যত্ন করে দু'বেলা আমাদের চর্ব-চোষ্য-লেহ্য পেয় খাওয়াচ্ছেন।

আমি কিছু বলবার আগেই দেবরাজ বলল, না, আমরা দু-একদিনের মধ্যেই চলে যাব, আমাদের থাকবার জায়গা আছে। আপনাদের বাড়িটা কোথায়?

সুজিত বলল, স্টেপ অ্যাসাইডের কাছেই, বাড়িটার নাম শান্তি ভবন— ওখানে গিয়ে ডঃ বিনয় লাহিড়ীর বাড়ি কোন্‌টা জিজ্ঞেস করলে যে কেউ দেখিয়ে দেবে। বাড়িটা বানিয়েছিলেন সুজাতার ঠাকুর্দা। তিনি শেষ জীবনে টানা আট-দশ বছর এখানেই ছিলেন। সবাই চিনত তাঁকে। এই তো গত বছর ঠিক এই সময় মারা গেছেন।

দেবরাজ জিজ্ঞেস করল, কোন বিনয় লাহিড়ী? যিনি এক সময় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির হিস্ট্রির হেড অব দা ডিপার্টমেন্ট ছিলেন?

সুজিত বলল, হ্যাঁ।

—যিনি 'টেম্পলস ইন উত্তরপ্রদেশ' বইটা লিখেছিলেন?

সুজিত এ কথাটার ঠিক উত্তর দিতে না পেরে তার স্ত্রীর দিকে তাকাল। সুজাতা বলল, হ্যাঁ, উনি আরো অনেক বই লিখেছেন।

চকচক করে উঠল দেবরাজের চোখ। কোনাকুনি একবার তাকাল আমার দিকে। আমি এই দৃষ্টির অর্থ জানি। অর্থাৎ ডঃ বিনয় লাহিড়ীর ভাণ্ডারে অনেক দুর্লভ বই থাকবার কথা। নিশ্চয়ই দেবরাজ এরকম দু-একটা বইয়ের সন্ধান রাখে।

দেবরাজ বলল, চলুন, হাঁটা যাক। আপনারা অন্য কোন দিকে যাচ্ছিলেন না তো?

সুজিত বলল, না, আমরা এখন ফিরছিলাম।

—চলুন, আপনাদের বাড়িটা দেখে আসা যাক।

ম্যালের ভিড় ছাড়িয়ে এসে আমরা আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম। ভালো বইয়ের খবর পেলে দেবরাজ সুন্দরী মেয়েদের দিকে তাকাতেও ভুলে যায়। সে সুজিতের কাছ থেকে বিনয় লাহিড়ী সম্পর্কে নানা রকম খবর জোগাড়ের চেষ্টা করতে লাগল। আমি হাঁটতে লাগলাম বিশাখার পাশাপাশি। বিশাখা বোনদের মধ্যে সেজো, ফোর্থ ইয়ারে পড়ে লেডি বেবোর্ন কলেজে। তার সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য আমার বুকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করছিল। কিন্তু আমি কথা বলতে জানি না। টুকটাক দু'একটা কাটা-কাটা কথা শুধু মনে আসে। আমার বন্ধু শুভ্রাংশু যদি এখানে থাকত, তাহলে এরই মধ্যে সে এদের তিনজনের মধ্যে যে-কোন একজনের কাঁধে হাত রাখত অবলীলাক্রমে।

এদের বাড়িটা পুরোনো হলেও সুন্দর। সামনের কম্পাউণ্ডে অনেকগুলো লতানে-গোলাপগাছ। আশেপাশে কয়েকটা নতুন বাড়ি উঠে জায়গাটা একটু ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। এককালে নিশ্চয়ই আরো সুন্দর শোভা ছিল।

সুজিত বলল, আয় ভেতরে একটু বসে যা।

দেবরাজ এজন্য তৈরি হয়েই ছিল। সে তো শুধু বাড়িটা দেখতে আসেনি। বাড়ির ভেতরে যাবার জন্যই এসেছে। আমার দিকে চোখের একটা ইঙ্গিত করে বলল, হ্যাঁ, একটু বসা যাক। অনেকক্ষণ হেঁটে-হেঁটে পা ব্যথা হয়ে গেছে।

দোতলায় যে-ঘরটায় এসে আমরা বসলাম, সে-ঘরে একটাও বই নেই। দেবরাজ চঞ্চলভাবে চারিদিকে তাকাচ্ছে। একসময় সুযোগ পেয়ে আমাকে জানাল, ডঃ বিনয় লাহিড়ী ফার্গুসনের কালেকশন কিনেছিলেন। দারুণ দারুণ বই থাকবার কথা কিন্তু এদের বাড়িতে।

সুজাতাদের মা এসে আলাপ করলেন আমাদের সঙ্গে। ভদ্রমহিলার বয়েস অন্তত পঞ্চাশ হওয়া উচিত, কারণ একটু আগে শুনেছি, সুজাতার ওপরে এক দাদা আছে, কিন্তু ভদ্রমহিলাকে দেখে এখনো তরুণী মনে হয়। মাথার একটা চুলও পাকেনি, চামড়ায় ভাঁজ নেই। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। ওঁর বয়েস পঁয়তিরিশ বললে কেউ অবিশ্বাস করবে না।

তিনি আমাদের মিষ্টি আর চা খাওয়াবেনই। যদিও আমাদের খাবার ইচ্ছে নেই একটুও। এবার দেবরাজের সঙ্গে বেরিয়ে আসল উদ্দেশ্য যেমন কিছু সফল হয়নি, কিন্তু অন্যদিকে আমাদের ভাগ্য খুবই ভালো দেখা যাচ্ছে। ভালো ভালো খাবার জায়গা আর অঢেল খাদ্য। সুজাতার মা আমাদের একটু মিষ্টিমুখ করাবার নাম করে তিন রকম খাবার এনে দিলেন এবং জোর করতে লাগলেন।

বিশাখা বলল, মা, সাবধান থেকো কিন্তু। উনি হয়তো তোমার এই মিষ্টি খাওয়ানো নিয়ে জোর করার কথা আবার কোন গল্পে লিখে দেবেন।

ভদ্রমহিলা মিষ্টি হেসে বললেন, তাই নাকি? তুমি লেখো বুঝি? তা আমাকে নিয়ে আর কী লিখবে? বুড়িদের সম্পর্কে লেখা কে আর পড়বে?

আমাকে উৎসাহের সঙ্গে বলতেই হলো, না, না, আপনি বুড়ি কে বলেছে?

ঘরের দেয়ালে অনেকগুলো ছবি। তার মধ্য থেকে ডঃ বিনয় লাহিড়ীকে দেবরাজ সহজেই চিনে নিল। ভদ্রলোকের মুখে রবীন্দ্রনাথের কায়দায় পাকা দাড়ি। তিনি শেষ জীবনে দার্জিলিং-এর গরীব নেপালীদের মধ্যে বিনা পয়সায় হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিলি করতেন।

দেবরাজ সুজাতার মাকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, ওনার তো প্রচুর বইপত্র ছিল শুনেছি ; সেগুলো এখানে নেই?

সুজাতার মা অলকা দেবী বললেন, আমার শ্বশুরমশাইয়ের বই কেনার বাতিক ছিল সাঙ্ঘাতিক। হাজার হাজার বই বাড়িতে। সেসব বই এখন রাখবার জায়গাই হয় না। এ বাড়িতেও ছিল অনেক বই। উনি মারা যাবার পর কিছু বিলি করে দেওয়া হয়েছে। কিছু নিয়ে রাখা হয়েছে কলকাতার বাড়িতে। এ বাড়িতে তো সারা বছর কেউ থাকে না। বছরে বড় জোর একবার আসা হয়। বড্ড চুরি হয় এখানে।

সরল ভালোমানুষের মতন মুখ করে দেবরাজ জিজ্ঞেস করলো, বই-ও চুরি হয়?

আমি হাসি চাপবার জন্য মুখ ফেরালাম।

অলকা দেবী বললেন, ছিঁচকে চোররা ঢুকে যা পায় তাই নষ্ট করে। সেইজন্য এখানে আর কিছু রাখি না।

দেবরাজ বলল, একদিন আপনাদের কলকাতার বাড়িতে যাব। বই দেখে আসব। পুরোনো বই দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। 'টেমপলস ইন উত্তরপ্রদেশ' বইটা অনেকদিন আউট অব প্রিন্ট, যদি একটু পড়বার সুযোগ পাই।

অলকা দেবী বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই এস আমাদের বাড়িতে। কলকাতায় আমাদের বাড়ি সি আই টি রোডে, পার্ক সার্কাস ময়দানের একটু আগে।

বুঝলাম, দেবরাজ লাইন তৈরি করে নিয়েছে। ওঁদের কলকাতার বাড়িতে সে নিশ্চয়ই হানা দেবে এরপর।

রাস্তার দিকের কাচের জানলার পাশে দাঁড়িয়েছিল বিশাখা। ওর সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য আমি দেয়ালের ছবি দেখবার ছুতোয় সেদিকে উঠে গেলাম।

একটা ছবির দিকে আমার চোখ আটকে গেল। পণ্ডিত রবিশঙ্করের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করছেন একজন দীর্ঘকায় মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। কোঁচানো ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবি পরা। ভদ্রলোকের চেহারায় বেশ ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। রবিশঙ্করের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন যখন, তখন ইনিও নিশ্চয়ই একজন কেউকেটা হবেন। অথচ আমি চিনি না। কিষেণ মহারাজ কিংবা আল্লারাখা নয় তো?

আমি বিশাখাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে?

বিশাখা বলল, আমার বাবা।

—ও, উনি বুঝি গান-বাজনা করেন?

বিশাখা হেসে ফেলে বলল, না, না। আমার বাবা কোথাও গান গাইতে যান না। তবে গান ভালোবাসেন খুব। ঐ ছবিটা তোলা হয়েছিল...

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ঠাকুর্দার মতন আপনার বাবাও বুঝি কোথাও পড়ান-টড়ান?

—না। বাবা বিজনেস দেখেন।

—রবিশঙ্কর আপনাদের বাড়িতে এসেছিলেন?

—বাড়িতে নয়, আমাদের হলে। রবিশঙ্কর একবার একটা চ্যারিটি ফাংশানে এসেছিলেন।

—কোথায় এসেছিলেন?

—আমাদের একটা সিনেমা হল আছে, রোহিণী, সেখানে।

—রোহিণী? শিয়ালদার কাছে?

—হ্যাঁ। এখন অবশ্য অনেকদিন সেটা বন্ধ। স্ট্রাইক-ফাইক কী যেন চলছে।

আমি হঠাৎ মূর্তির মতন স্থির হয়ে গেলাম। আমার হাতে খাবারের প্লেট, তাতে দুটি করে শোনপাপড়ি, রসকদম্ব আর ছানার জিলিপি। মাত্র কয়েকদিন আগে আমি রোহিণী সিনেমার সামনের ফুটপাথের ওপর অনশনরত ধর্মঘটীদের সঙ্গে বসেছিলাম কিছুক্ষণ। আর আজ, সেই সিনেমা হলের মালিকের বাড়িতে, তাঁর সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে লোভনীয় সব খাবার খেতে-খেতে গল্প করছি।

আমার ঠোঁটে একটা হাসি ফুটে উঠল।

৩

সকালবেলা চা খাওয়ার সময় খবরের কাগজ পড়তে পড়তে দাদা হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর কাগজটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, পাঁচের পাতায় তিনের কলমের নিচের দিকটা পড়ে দ্যাখ। ওদের খবর বেরিয়েছে।

—কাদের খবর?

—পড়েই দ্যাখ না।

এত ছোট হেডিং যে খবরটা সহজে খুঁজে পাওয়াই যায় না। তারপর চোখে পড়ল। দশ-বারো লাইনের একটা টুকরো সংবাদ। রোহিণী সিনেমা হলের কর্মচারীদের ধর্মঘট দুশো-সতেরো দিনে পড়েছে। এঁদের মধ্যে একজন গুরুতরভাবে গতকাল অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ছাঁটাই রোধ ও বেতন-বৃদ্ধির দাবিতে এই ধর্মঘট শুরু হয়েছে গত বছর নভেম্বর মাস থেকে।

যাক, এতদিন বাদে ওদের খবর তা হলে বার হলো কাগজে। অনশনকারীদের

মধ্যে কেউ মারা গেলে বোধহয় আরো বড় খবর হবে। জীবন্মৃতদের নিয়ে কোন সংবাদ হয় না।

আমি মুখ তুলতেই দাদা বললেন, বোধহয় রমেশ জ্যাঠামশাই?

আমি চুপ করে রইলাম। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় যাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, তিনি আমাদের রমেশ জ্যাঠামশাই হতেই পারেন। সেটাই বেশি সম্ভব।

দাদা বললেন, একবার খোঁজ নেওয়া উচিত মনে হয়।

একথাটা বলার উদ্দেশ্য আমি জানি। অর্থাৎ খোঁজ নিতে হবে আমাকেই। দাদা নিজে সব সময় দায়িত্ব এড়িয়ে চলেন। যা কিছু সাংসারিক ঝুটঝামেলা চাপে আমার কাঁধে। কারণ আমি বাড়ির বেকার ছেলে।

মেজদা নিজের ঘরে বসে রেডিওটা নিয়ে গুটগাট করছিল। দাদা ডেকে পাঠালেন তাকে। মেজদাকেও খবরটা পড়িয়ে বললেন, আমাদের একটা কিছু করা দরকার নয়? তুই কি বলিস?

মেজদা বলল, হুঁ।

দাদা বললেন, একবার রমেশ জ্যাঠার বাড়িতে—

মেজদা বলল, বোধহয় বেলেঘাটার ওদিকে...এক সময় তো ওদিকেই থাকতেন জানি।

দাদা বললেন, তা হলে দুপুরের আগেই একবার—

মেজদা চঞ্চল হয়ে বলল, আমার কলেজে আজ আবার বিশেষ কয়েকটা কাজ আছে, ইউনিয়ানেব মিটিং, আমি না গেলে হবেই না। নইলে আমি—

দাদা উঠে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার খুলে মানি ব্যাগটা বার করলেন। ভেতরের নোটগুলো নিয়ে একটুক্ষণ নাড়াচাড়া করে দু' তিনবার পাল্টাবার পর একটি পঞ্চাশ টাকার নোট তুলে নিলেন, দু' আঙুলে। মেজদার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই তিরিশটা টাকা দে। আর নীলু কুড়িটা টাকা নিজে জোগাড় করুক। এই একশোটা টাকা অন্তত পৌঁছে দিয়ে আসা দরকার।

ইতিমধ্যেই মা এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার কাছে। সবটা না জেনেও দুটো একটা টুকরো কথা শুনেই অনুমান করে নিলেন ব্যাপারটা। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কাকে টাকা দিচ্ছিস? কেতকীর বাবাকে? কেন, তোদের কী দরকার?

মাসের তিন তারিখ, দাদা আর মেজদা, দু'জনেরই হাতে এখন টাকা আছে। সুতরাং কিছু টাকা খসিয়ে বিবেকটা পরিষ্কার করতে দু'জনে খুব ব্যস্ত।

মা আবার বললেন, কেন, টাকা পাঠাতে যাচ্ছিস কেন তোরা? টাকা-পয়সা কি অঢেল হয়েছে? খালি তো সংসারে শুনি নেই আর নেই। মাস ফুরোবার আগেই তেল ফুরিয়ে যায়, বাজার থেকে মাছ আসে না।

দাদা বললেন, কাগজে বেরিয়েছে রমেশ জ্যাঠার অবস্থা খুব খারাপ।

মা বললেন, সে আমরা কী করব? গভর্নমেণ্ট ব্যবস্থা করতে পারে না? তাছাড়া, ওনার অতবড় ছেলে রয়েছে, সেও রোজগার করে, বাপকে দেখতে পারে না সে?

দাদা এবার মায়ের দিকে চোখ তুলে গম্ভীর শান্ত গলায় বললেন, শোনো, আমি জানি, বাবা বেঁচে থাকলে এই সময় রমেশ জ্যাঠাকে কিছু-না-কিছু সাহায্য করতেনই। বাবা নেই বলে আমরা সামান্য কিছুও করতে পারব না?

একথা শুনে মা নিবৃত্ত হলেন না। গজগজ করে বলতে লাগলেন, যেমন ছিল তোদের বাবা, দান-ধ্যান করে সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে। নিজেদের যে কীভাবে চলবে সে খেয়াল ছিল না...।

বোঝা গেল, কোন কারণে রমেশ জ্যাঠার ওপর মায়ের বিশেষ রাগ আছে।

মেজদা বলল, রমেশ জ্যাঠা দিনের পর দিন আমাদের বাড়িতে খেয়ে গেছেন। উনি খেতে ভালোবাসতেন বলে বাবা জোর করে ওঁকে খাওয়াতেন। তোমার সেসব কথা মনে নেই মা?

মা বললেন, মনে থাকবে না কেন? কতদিন জ্বালিয়েছে আমাকে।

মেজদা বলল, সরমা জ্যাঠাইমা নিশ্চয়ই ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুব বিপদে পড়েছেন এই সময়।

মা এইবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ওর তো ভাগ্যটাই খারাপ। ওর আবার বাপের বাড়ির দিকেরও কেউ নেই...

দাদা আমাকে বললেন, ক'দিন ধরে আমার বড্ড কাজ, নইলে আমি নিজেই যেতাম, তুই টাকা নিয়ে জ্যাঠাইমার হাতে দিবি। রমেশ জ্যাঠার হাতে দিস না। বলবি, মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দাদার স্বভাব আমি জানি। নিজে কোথায়ও যায় না। এই রকম কিছু ব্যাপার হলেই সব সময় টাকা দিয়ে দায় সারতে চায়।

আমি বললাম, আর যদি রমেশ জ্যাঠাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়ে থাকে?

দাদা, মেজদা দু'জনেই একটু অস্বস্তিতে পড়ল। তাহলে আরো দায়িত্ব পড়ে যায়। রমেশ জ্যাঠা আমাদের এমন কিছু আত্মীয় নন যে, ওঁর জন্য আমাদের সত্যি-সত্যি উদ্বেগ বোধ করতে হবে। নেহাত বাবার সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই যেটুকু কর্তব্যবোধ।

দাদা কিছু বলতে পারলেন না। কিন্তু মেজদা বেশ কায়দা করে নিজেকে বাঁচিয়ে নিল। মেজদা বলল, হাসপাতালে চিকিৎসা হবে নিশ্চয়ই। যদি কোন ওষুধ-টসুধের দরকার হয় আমাকে একটা খবর দিস। আমার বন্ধু পবিত্র ঘোষ একটা

ওষুধ কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার, ওকে বলে কিছু ওষুধের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

দাদা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খবর দিস।

ব্যস, ওরা দু'জনে দায়মুক্ত হয়ে গেল।

রমেশ জ্যাঠার বাড়িটা ঠিক কোথায়, সেটা জানা গেল না। দাদা, মেজদা কারুরই ঠিক মনে নেই। মা বললেন, ঐ বেলেঘাটার ওদিকে কোথায় যেন!

সুতরাং মুড়ি ও ডিম সেদ্ধ খেয়ে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হলো। রোহিণী সিনেমা হলের কাছে গেলেই রমেশ জ্যাঠার খোঁজ পাওয়া যাবে।

কিন্তু আমি অন্য একটা সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

দাদা আর মেজদা মিলে দিয়েছে আশি টাকা। বাকি কুড়ি টাকা আমাকে দিতে হবে। টাকা আমার কাছে নেই তা নয়। মাসের গোড়ায় টিউশানির মাইনে পেয়েছি, আমার কাছে রয়েছে এখনো বিরানব্বই টাকা। কিন্তু এর থেকে হঠাৎ কুড়ি টাকা এইভাবে খরচ করলে সারা মাসে আমার চলবে কী করে? ট্রাম-বাস ভাড়া, চা-সিগারেটের খরচাও তো আছে। দাদা-মেজদা মিলে পুরো একশো টাকা দিতে পারত না?

সরমা জ্যাঠাইমার হাতে যদি আমি আশি টাকা দিই? দাদা-মেজদা কোনদিন জানতেও পারবে না, আমি আশি টাকা দিয়েছি, না একশো! আর রমেশ জ্যাঠারা তো আমাদের কাছ থেকে টাকা পাবার কোন আশাই করেননি। সুতরাং আশি টাকা পেলেই বা কম কী? অবশ্য গোল সংখ্যা বা রাউন্ড ফিগার দেওয়াই নিয়ম। পঞ্চাশ, পঁচাত্তর বা একশো। পঁচাত্তর? আমারও যাতায়াতের খরচ আছে।

রোহিণী সিনেমা হলের সামনে রমেশ জ্যাঠাকে দেখতে পেলাম না। অন্যরা আছেন। এই ক'দিনের পরিবর্তনের মধ্যে শুধু এই দেখলাম যে, চাটাইটা আরো ছিঁড়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ফুটপাথের ওপরেই বসেছে সবাই। আজও তাশ খেলা চলেছে।

সেদিন যে লোকটির সঙ্গে রমেশ জ্যাঠা আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর পাশে উবু হয়ে বসে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, রমেশ মুখার্জি আপনাদের এখানে ছিলেন, তিনি কোথায় বলতে পারেন?

তিনি অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, হাসপাতালে গেছেন।

আমার বুকটা ধক্ করে উঠল। তা হলে উনিই? আরো ঝামেলা বেড়ে গেল যে!

পরক্ষণেই অবশ্য স্বস্তি ফিরে পেলাম। লোকটি বললেন, আমাদের একজন হাসপাতালে গেছে, পেপারে বেরিয়েছে খবরটা, দেখেননি? এতদিন বাদে

পেপারওয়ালাদের টনক নড়েছে। আমরা ক'জন মানুষ যে এখানে মরতে বসেছি, সেদিকে খেয়ালই নেই কারুর। রাইটার্স বিল্ডিংসে গিয়ে স্মারকপত্র দিয়ে এলাম... অজিত দাস হাসপাতালে গেছে। এবার একে একে আমরাও সবাই যাব। রমেশদা গেছেন অজিতের খবর আনতে। যদি দেখা করতে চান, ও বেলা আসবেন।

ওঃ, যাক বাঁচা গেল! রমেশ জ্যাঠা হাসপাতালে ভর্তি হননি। এখনো হাঁটাচলার ক্ষমতা রয়েছে।

লোকটির কাছ থেকে রমেশ জ্যাঠার বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গেল। সেটা জেনে নিয়ে আমি উঠে পড়লাম।

বেলেঘাটার দিকে আমি বেশি যাইনি। আগে বেলেঘাটা শুনলেই একটা নোংরা ঘিঞ্জি এলাকার কথা মনে আসত। এখন অনেক চওড়া চওড়া রাস্তা হয়েছে, উঠেছে অনেক সুন্দর সুন্দর নতুন বাড়ি। কিন্তু পুরোনো নোংরা গলি আর বস্তিও রয়ে গেছে পাশাপাশি।

রমেশ জ্যাঠার বাড়ি কিন্তু বস্তির মধ্যে নয়, বস্তির পাশের একটা ভাঙা মতন দোতলা বাড়িতে। অর্থাৎ তিনি এখনো ভদ্রলোক শ্রেণীর অন্তর্গত। ঠিকানা মিলিয়ে সে বাড়িতে ঢুকতে গিয়েও আমি থমকে গেলাম। আমার একটু ভয়-ভয় করতে লাগল, কী দেখব বাড়ির মধ্যে? দারিদ্র্য জিনিসটার মুখোমুখি কে আসতে চায়? একজন সিনেমা হলের সামান্য কর্মচারী যদি সাত-আট মাস মাইনে না পায়, তাহলে সে-বাড়ির লোক বেঁচে থাকে কেমন করে?

রমেশ জ্যাঠা হাসপাতালে গেছেন। ওঁর সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো। জ্যাঠাইমার হাতে কোন রকমে টাকাটা দিয়ে পালিয়ে আসতে হবে তাড়াতাড়ি।

রাস্তার পাশের নর্দমা উপচে জল ছড়িয়ে আছে বাড়িটার দরজা পর্যন্ত। আমি দূর থেকে একটা লাফ দিয়ে সেই জল ডিঙ্গিয়ে পৌঁছোলাম সদরে। দরজাটা খোলাই ছিল।

ভেতরে একটা ছোট চাতাল, তারপর উঁচু রকের ওপর দু'খানা ঘর। একজন লোক রকের ওপর বসে গায়ে সর্ষের তেল মাখছে। খুব মলিন ফ্রক-পরা একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে কাছেই দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। লোকটি বলল, এই সন্টি, আমার পিঠটায় একটু তেল মাখিয়ে দে তো। মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটি আবার বলল, দে না, দশটা পয়সা দেব এখন! মেয়েটি তেলের বাটিতে হাত ডোবাল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে...রমেশ মুখার্জি...

লোকটি একবার আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, ডান দিকে সিঁড়ি, ওপরে উঠে যান!

সিঁড়ির ইঁট লোকের পায়ে পায়ে ক্ষয়ে পাতলা হয়ে গেছে। দোতলার সিঁড়ির মুখে একটা চটের পর্দা ঝোলানো। উঠতে উঠতে আমি শুনতে পেলাম, কে যেন একজন লোক বলছে, হারামজাদী, মেরে তোর মুখ ভেঙে দেব! কোন একটা কাজ পারে না। বললাম বিকাশকে একবার ডেকে আন, সে কথা গ্রাহ্য নেই! মর মর, মরতে পারিস না। তা হলে আমার হাড় জুড়োয়!

আমি একটুখানি অপেক্ষা করে রইলাম। বকুনি খানিকটা কমলে আমি শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, জ্যাঠামশাই!

পুরুষ গলায় আওয়াজ এল, কে?

তারপর চটের পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়ালেন স্বয়ং রমেশ জ্যাঠামশাই। আমি একটু অবাক হলাম। এঁর তো এখন হাসপাতালে থাকবার কথা।

তিনিও যথেষ্ট অবাক হলেন আমাকে দেখে। হাঁ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বললেন, কে, নীলু? কী ব্যাপার? আয় আয়—

রমেশ জ্যাঠামশাই একটা ছোট ধুতিকে লুঙ্গির মতন পরে আছেন। খালি গা, বুকের প্রত্যেকটি পাঁজরা স্পষ্ট। যাত্রা-থিয়েটারের ভৌতিক গল্পে ওঁকে অনায়াসে জ্যান্ত কঙ্কালের পার্ট দেওয়া যায়।

বারান্দায় একটি তক্তাপোষ পাতা, রমেশ জ্যাঠামশাই সেখানে আমাকে বসতে দিলেন। একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে কাঁদছিল, সে দৌড়ে ভিতরে পালালো আমাকে দেখে। মেয়েটির মুখ আমি ভালো করে দেখতে পেলাম না। একবার মনে হলো, এই কি কেতকী?

সরমা জ্যাঠাইমা একটা দরজার আড়াল থেকে মুখ বার করে আমাকে দেখলেন। আবার চট করে সরে গেলেন।

রমেশ জ্যাঠা বললেন, এসো, এদিকে এসো, এ তো আমাদের নীলু, এর সামনে আর লজ্জা কী?

সরমা জ্যাঠাইমা একটু পরেই বুকের কাছে একটা গামছা জড়িয়ে এলেন। ওঁর শাড়িটা ছেঁড়া, গায়ে ব্লাউজ নেই। সরমা জ্যাঠাইমা রমেশ জ্যাঠার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। এখনো তাঁর শরীর বিষয়ে লজ্জার ভাবটা যায়নি।

আমি উঠে দু'জনকেই প্রণাম করলাম।

অনেকদিন আগে সরমা জ্যাঠাইমাকে যেরকম দেখেছিলাম, তার চেয়ে উনি বিশেষ কিছু বদলাননি। তবে, সে-সময় মুখখানা ছিল কোমল স্নেহমাখা, এখন সেখানে অনেকগুলো দাগ। কিন্তু দারিদ্র্যে উনি নোংরা হয়ে যাননি, মুখে এখনো খানিকটা আভিজাত্যের ছাপ আছে।

আমি বললাম, মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

সরমা জ্যাঠাইমা মৃদুভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ তোমরা সবাই? তোমার মায়ের শরীর কেমন আছে?

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ভালো।

এই বাড়ির পরিবেশে সরমা জ্যাঠাইমাকে যেন একেবারেই মানায় না। টকটকে ফর্সা রং, পিঠ ছড়ানো কাঁচা পাকা চুল, একটু ভারী শরীর, ওঁকে যেন জমিদার বাড়ির গিন্নী হলেই মানাত। শুনেছি এক গোড়ন্ত বড় বংশেরই মেয়ে উনি। এখনো ওঁর গলার আওয়াজে কোন রকম অভিমান বা দীনতা নেই। নিজেদের কথা না বলে আগেই আমাদের বাড়ির খবর নিলেন।

রমেশ জ্যাঠা বললেন, আর তো কেউ আমাদের খবরও রাখে না, মরলাম কি বাঁচলাম!

আমি বললাম, আজকের কাগজে আপনাদের খবর বেরিয়েছে দেখে মা বললেন, যা একবার দেখে আয়। আপনাদের একজন হাসপাতালে গেছে, তাই আমরা ভাবলাম—

—ভেবেছো, আমিই বুঝি গেছি? আমার কড়া জান। এই বুড়োর হাড়ে এখনো যা শক্তি আছে, তা অনেকের নেই। আমি যদি মরি তো একেবারে শিবশঙ্কর লাহিড়ীর বাড়ির দোর গোড়ায় গিয়ে মরব! তারপর ভূত হয়ে ওর গলা টিপব। হারামজাদা!

সরমা জ্যাঠাইমা বললেন, থাক, চুপ করো!

—কেন চুপ করব? আমরা ক'টা লোক না খেয়ে খেয়ে মরে যাচ্ছি, আর ও আরামে থাকবে, যা খুশি করে যাবে? ব্যাটা কোন খোঁজও নেয় না। আমাদের সঙ্গে কোন রকম আলাপ-আলোচনা করতেও রাজি নয়! শূয়ার কা বাচ্চা! যেন আমরা সব ক'টা মরে গেলে তারপর ও আবার নতুন লোক এনে রোহিণী খুলবে। এর কোন বিচার নেই? গভর্নমেণ্ট দেখে না, ই আই এম পি এ দেখে না, কেউ দেখে না—ওঃ, হুঁ হুঁ।

রাগ দেখাতে গিয়ে রমেশ জ্যাঠা হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। এরকম একজন বৃদ্ধ লোককে আমি কখনো কাঁদতে দেখিনি। বৃদ্ধদের কান্না দেখতেও ভালো লাগে না। শিশু বা নারীদের কান্নার মতন এতে কোন করুণ রস বা সৌন্দর্য নেই। বরং দেখলে হাসি পায়! এসব ক্ষেত্রে কীরকম ব্যবহার করা উচিত, তা জানি না। তবু কথা ঘোরাবার জন্য আমি জ্যাঠাইমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এ বাড়িতে কতদিন আছেন?

জ্যাঠাইমা বললেন, তা বছর কুড়িক হবে।

রমেশ জ্যাঠা মুখ তুলে বললেন, তেইশ বছর!

কাঁদতে গিয়ে রমেশ জ্যাঠার শিকনি বেরিয়ে গিয়েছিল। সশব্দে নাক ঝাড়লেন এবার। বাঁ হাতে সেটা মুছলেন। এইরকম নোংরা ব্যাপার দেখলে আমার গা গুলিয়ে ওঠে।

জ্যাঠামশাই হাঁক দিলেন, মন্টি, এক মগ জল নিয়ে আয়!

যে-মেয়েটি একটু আগে এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল সে এক মগ জল নিয়ে এল। জ্যাঠামশাই তার মধ্যে হাত ডুবিয়ে হাত ধুলেন। তারপর আবার দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মেয়েটিকে বললেন, গামছাটা আনতে পারনি, না? হাত মুছব কিসে! মেয়েটি নিঃশব্দে আবার গামছা এনে দিল। জ্যাঠামশাই তো উঠে গিয়ে বাথরুমেও ধুয়ে আসতে পারতেন। যত গরীবই হোক, এক-একজন লোক থাকে, নিজের বাড়িতে ঠিক বাদশার মতন। সব সময় হুকুম চালায়।

—এই মন্টি, একে প্রণাম করেছিস? তোদের এক রকম দাদা হয়।

মেয়েটি নিচু হয়ে প্রণাম করতে এল, আমি সসঙ্কোচে পা সরিয়ে নিয়ে বললাম, আরে না না, আমাকে প্রণাম করতে হবে না।

কিন্তু সে বারণ শুনল না, পা ছুঁয়ে দিল। ঠাণ্ডা নরম হাত—আমার পা শিরশির করে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ভালো নাম কি কেতকী?

এ বাড়িতে বেশির ভাগ কথা জ্যাঠামশাই-ই বলে থাকেন। অন্যকে কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেন তিনিই। মন্টি কিছু বলার আগেই জ্যাঠামশাই বললেন, না, ওর নাম ছন্দা। কেতকী আমার বড় মেয়ে, তার বিয়ে হয়ে গেছে। এখনো ঘাড়ের ওপর তিনটে মেয়ে রয়েছে। এদের বিয়ে দেবার সাধ্য আমার নেই। বিয়ে মানেই তো এক কাঁড়ি টাকা। পেটে ভাত জোটে না, পারব না, আমি আর পারব না. সারাজীবন অনেক করেছি...এখন নিজেরা যা পারবে করবে।

আমি ছন্দাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী পড়ো?

এবারও জ্যাঠামশাই উত্তর দিলেন, পড়বে আবার কী? ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়ে ছেড়ে দিয়েছে। পড়ার খরচটা কে চালাবে? আমার তো এখন আয় বলতে বাড়ি ভাড়ার দেড়শোটি টাকা! তাতে এতগুলো পেটের ক্ষিধেই মেটে না!

বাড়ি ভাড়ার কথা শুনে আমি একটু চমকে উঠলাম। সেটা বুঝে জ্যাঠামশাই বললেন, তেইশ বছর আগে এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম পঞ্চান্ন টাকায়। এখন বাড়তে বাড়তে হয়েছে সাতাশি টাকা। আগে রেন্ট কন্ট্রোলে জমা দিতাম, এখন তাও দিই না। বাড়িওলার সঙ্গে মামলা চলেছে। চলুক মামলা। চার-পাঁচ বছরের আগে তো মিটবে না। তখন যদি হারি তো এক পয়সাও ভাড়া না দিয়ে উঠে যাব!

বাড়িওয়ালা নামক লোকটিকে ঠকাতে পারছেন বলে জ্যাঠামশাইয়ের মুখে বেশ একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল।

তিনি আবার বললেন, নিচের দু'খানা ঘর সাব-লেট করে দিয়েছি, দেড়শো টাকা পাই। সেটা-ই আমার এখন একমাত্র রোজগার।

কাজটা স্পষ্টতই বে-আইনী। অন্য লোকের বাড়ি তিনি বিনা ভাড়ায় জবর দখল করে রেখেছেন এবং সেই বাড়ি থেকে নিজে টাকা রোজগার করছেন। কিন্তু যে-লোক সাত-আট মাস মাইনে পায় না, তার কাছে আইনের কোন মূল্য আছে কী?

যাই হোক, আমার একটা খটকা মিটল। জ্যাঠামশাই অন্তত সাত মাস মাইনে পান না। সেইজন্যই আমি ভাবছিলাম, এতদিন এঁদের খাওয়া-পরা চলছে কী করে? রমেশ জ্যাঠার যেরকম উড়নচণ্ডী স্বভাব, তাতে জ্যাঠাইমার গয়নাগাঁটির কিছুও এতদিন অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। আর এরকম লোককে ধারই বা কে দেবে? যাক, তবু দেড়শো টাকা রোজগার আছে। অবশ্য, দেড়শো টাকায় এতগুলো লোকের খাদ্য জোটানো যায় আজকাল? আমি বেকার, টিউশানি ইত্যাদিতে যে শ' খানেক টাকা পাই, তাতে আমার হাত-খরচই ঠিক মতন চলে না। মাসের শেষে কম পড়ে যায়। হঠাৎ একটু লজ্জিত বোধ করলাম।

আমি সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়ই আমার বাঁ পকেট থেকে কুড়িটা টাকা বার করে ডান পকেটের টাকার সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছিলাম। এবার সেই একশো টাকা আস্তে আস্তে বার করে জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমার মাঝামাঝি খাটের ওপর রাখলাম। তারপর খুব নিচু গলায় বললাম, মা এই টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন।

জ্যাঠাইমার হাতেই দেওয়া উচিত ছিল ঐ টাকা। কিন্তু এত অভাবের মধ্যেও সরমা জ্যাঠাইমার আত্মসম্মানবোধ নষ্ট হয়নি। তাঁর মুখে একটু লজ্জার ছায়া ফুটে উঠল। তিনি মুখটা ফিরিয়ে নিলেন অন্যদিকে।

জ্যাঠামশাই কিন্তু তক্ষুনি খপ করে তুলে নিলেন টাকাগুলো। নির্লজ্জের মতন গুনলেন আমার সামনেই। কোনরকম কৃতজ্ঞতার ভাব না দেখিয়ে বললেন, তোর বড়দা ব্যাঙ্কে ভালো চাকরি করে না?

এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। আমার দাদা যখন ব্যাঙ্কে চাকরি করেন, তখন মাত্র একশো টাকা না দিয়ে আরো বেশি সাহায্য পাঠানো উচিত ছিল!

জ্যাঠাইমা তাড়াতাড়ি এদিকটা সামলাবার জন্য বললেন, তোর মা বড় ভালো মানুষ! মনটা এত নরম, দেখেছি তো কতবার!

জ্যাঠামশাই বললেন, বৌমার ভাগ্যটা কত ভালো! তিন তিনটে ছেলে, সবাই দাঁড়িয়ে গেছে। আর আমার ঘাড়ে জুটেছে চারটে মেয়ে!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ছেলে কোথায় থাকে?

জ্যাঠামশাই স্পষ্ট উত্তর দিলেন, জেলে।

জ্যাঠাইমা মুখ ফেরালেন।

আমি একটু চমকে উঠলাম। অবশ্য আজকাল অনেকে নানা কারণে জেলে যায়। কিন্তু এরকম অপ্রিয় প্রসঙ্গ আমার না তোলাই উচিত ছিল। জ্যাঠামশাই আমার চোখের দিকে তীব্র ভাবে তাকিয়ে আছেন। অপেক্ষা করছেন আমার পরবর্তী প্রশ্নের। কিন্তু আমি চঞ্চল ভাবে চোখ সরিয়ে নিলাম।

জ্যাঠামশাই নিজেই আবার বললেন, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই নেই, এ বাড়িতে সে থাকে না অনেকদিন। সে গুণ্ডামি বদমাইসি করে বেড়াত, শুনেছি মাস কয়েক আগে পুলিশ তাকে জেলে ভরে দিয়েছে। ঠিক মতন পুলিশকে ঘুষ দিতে পারেনি বোধহয়!

আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবার যেতে হবে।

জ্যাঠামশাই অমনি হা-হা করে উঠলেন। সে কি? এর মধ্যে চলে যাবি? না না, একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে, প্রথম এলি এ বাড়িতে—

এটা একটা অসম্ভব কথা। যে-বাড়িতে হাঁড়ি চড়া দায়, সে-বাড়িতে আমি মিষ্টি খাব? এ তো কল্পনাও করা যায় না!

আমি জোর করে চলে আসবার চেষ্টা করলাম। অনেক করে বোঝালাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। জ্যাঠামশাই তাঁর রোগা হাত দিয়ে আমাকে ধরে রইলেন, জ্যাঠাইমা আমার পথ আটকে দাঁড়ালেন। এমনকি ছন্দা নামের মেয়েটি, যে এ পর্যন্ত একটুও কথা বলেনি, সে পর্যন্ত এবার অনুনয় করে বলল, এক্ষুনি যাবেন না, একটু বসুন! মিষ্টি খাওয়াবার জন্য এরকম জোরাজুরি করাটাও একটা বাঙালেপনা!

এই সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল একটি ফ্রক-পরা কিশোরী মেয়ে। একে নিচে দেখেছিলাম, একজন ভাড়াটের পিঠে তেল মাখাচ্ছিল। মেয়েটির পেটের কাছে ফ্রকটা ছেঁড়া, আমাকে দেখে টেনেটুনে ঠিক করবার চেষ্টা করল একটু।

জ্যাঠামশাই আমার দেওয়া টাকা থেকেই একটা দশ টাকার নোট বার করে নিয়ে সেই মেয়েটিকে বললেন, সৃষ্টি, যা তো, দু' টাকার মিষ্টি নিয়ে আয়! দৌড়ে নিয়ে আসবি। এই তোর এক দাদা, প্রণাম করে যা আগে।

তাহলে এ আমার এই জ্যাঠামশাইয়ের আর এক মেয়ে। কেউ কাউকে চিনতে পারিনি।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার আর এক মেয়ে কোথায়?

জ্যাঠামশাই বললেন, সে এক জায়গায় কাজ করতে যায়। সন্ধের পর আসবে।

সে যে কী কাজ করতে যায়, সেটা আর জানতে চাইলাম না। এই কিশোরীটির ঐ ভাড়াটে লোকটির পিঠে তেল মাখানোর দৃশ্যটি চোখে ভেসে উঠল। কী রকম কী রকম যেন লাগে।

যতক্ষণ না মিষ্টি আসে, ততক্ষণ আমাকে বসে থাকতে হবে। এই এক অসহ্য অবস্থা। সময় কাটাবার জন্যই জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের স্ট্রাইকটা কী জন্য হলো?

জ্যাঠামশাই বললেন, আমার জন্য।

জ্যাঠাইমা বললেন, আহা, তোমার জন্য হবে কেন? রমেন আর দীপকই তো গোলমাল পাকাল।

কিন্তু জ্যাঠামশাই নিজের কৃতিত্ব ছাড়তে চান না। বললেন, কেন? প্রথমে তো শুরু হয়েছিল আমাকে নিয়েই। আমার বয়েস হয়ে গেছে বলে আমাকে বরখাস্ত করতে চেয়েছিল মালিক!

আমি ভাবলাম, মালিকের দিক থেকে এটাকে খুব একটা অন্যায় বলা যায় কি? একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধকে কে কোথায় চাকরিতে রাখতে চায়!

জ্যাঠামশাই বললেন, আমার বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু কাজে কোন গাফিলতি আছে? একদিনও কামাই করি? এককালে আমার নিজের ফটোগ্রাফির শখ ছিল, ক্যামেরা আর ফিলিমের জন্য কত পয়সা খরচ করেছি! এখন ওখানে প্রোজেকশান অপারেটারের কাজ করি, কোনদিন কোন দর্শক বলেনি যে আমার সময় ছবি কাঁপে। তা হলে? কেন ছাঁটাই করবে? একেই তো মাইনে কম দেয়। আর আমাদের বরখাস্ত হওয়া মানে কি জানো? পেনশান নেই, প্রভিডেন্ড ফান্ড নেই, গ্র্যাচুইটি নেই, যাও বললেই খালি হাতে চলে যাও! সেই ছাঁটাই মেনে নেব কেন?

আমি বললাম, ঠিকই তো!

জ্যাঠামশাই বললেন, মালিক আমাকে ঠিক ছাঁটাই করতে চায়নি। একটু টাইট দিতে চেয়েছিল শুধু। মালিকদের কায়দাই হচ্ছে মাঝে মাঝে একবার করে ভয় দেখিয়ে রাখা! আরে, আমি ও ব্যাটাকে ভয় পেতে যাব কেন? আমি তো নিজের দাম বুঝি!

জ্যাঠাইমা বললেন, তুমি বড্ড বেশি কথা বলো বলেই তো—

রমেশ জ্যাঠা বললেন, তুমি চুপ করো! যা উচিত কথা, তা বলতে কক্ষনো ভয় পাই না আমি। এত কম মাইনেয় আমার মতন এত ভালো লোক আর পাবে

শিবু লাহিড়ী? আজকালকার ছেলে-ছোকরারা মন দিয়ে কাজ করে? তাদের দায়িত্বজ্ঞান আছে আমাদের মতন?

জ্যাঠাইমা বললেন, তুমি কিন্তু বড্ড বেশি কামাই করতে শুরু করেছিলে—

জ্যাঠামশাই তাঁকে এক ধমক দিয়ে বললেন, তুমি চুপ করো! মানুষের কি অসুখ-বিসুখ হয় না? কি রে?

জ্যাঠামশাই শেষ প্রশ্নটা আমাকে করলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, তা তো বটেই!

জ্যাঠামশাই সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, বুঝলি নীলু, মালিক অবশ্য আমার কথাটা মেনে নিয়েছিল। ছাঁটাই রুখে দিয়েছিল। কিন্তু রমেন আর দীপক গেল মাইনে বাড়াবার জন্য দরবার করতে। কিছু চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলেছিল—ওরা দু'জনেই কাউণ্টারে বসে তো, তাই বলেছিল, আপনি যে অ্যামিউজমেণ্ট ট্যাক্স ফাঁকি দেন, সেকথা ফাঁস করে দেব। প্রটেকশান মানির নাম করে প্রত্যেক হপ্তায় ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নেন ব্ল্যাকে...ব্যস আর যায় কোথায়! সাপের মাথায় পা পড়ল। মালিক তখন সবাইকে ডেকে বলল, মাইনে বাড়াব, রমেশ মুখুজ্যেকেও রাখব, কিন্তু রমেন আর দীপককে চলে যেতে হবে। ওরা মালিকের মুখে মুখে কথা বলেছে, ওদের আর কিছুতেই রাখা হবে না। শুরু হয়ে গেল স্ট্রাইক।

—মালিক যাকে খুশি যখন তখন ছাঁটাইয়ের হুমকি দিতে পারে? আপনাদের ইউনিয়ান নেই?

—দশ বারো জন লোকের আবার ইউনিয়ান কি?

—কিন্তু আজকাল শুনেছি, দোকান-টোকানের কর্মচারীরাও—

—আরে রাখ রাখ! ও সব কাগুজে কথা! জোর যার মুল্লুক তার এখনো এই নিয়মই চলছে।

—মালিকের জোর বেশি, না আপনাদের?

—আমাদের! আমরা গেট না ছাড়লে রৌহিণী কিছুতেই খুলবে না।

—কিন্তু মালিক যদি শেষ পর্যন্ত আপনাদের দাবি মেনে না নেয়?

—আলবাৎ মানবে! ওর বাবা মানবে! পূজাটা আসুক না! পূজার সময় হল বন্ধ রাখতে পারবে? মোটা লাভের সময়!

সন্টি বেশ তাড়াতাড়িই মিষ্টি নিয়ে ফিরে এল। একটা মাটির খুরিতে চারটে ছোট ছোট রসগোল্লা। এরই দাম দু' টাকা। অর্থাৎ দুটি টাকা একেবারে জলাঞ্জলি দেওয়া।

জ্যাঠাইমা প্লেট আনতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে আমি আঙুলে একটা রসগোল্লা তুলে নিয়ে বললাম, ব্যস, আর খাব না আমি, কিছুতেই না।

জীবনে এমন অনিচ্ছার সঙ্গে কোনদিন কোন খাবার খাইনি। রসগোল্লাটা যেন তেতো লাগল।

জ্যাঠামশাই বেশি জোর করলেন না আর। নিজেও একটা রসগোল্লা তুলে নিয়ে মুখে পুরলেন।

তাই দেখে আমার মনে হলো, সিনেমা হলের সামনে অবিরাম অনশন করলেও বাড়িতে এসে উনি লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার খান।

কিন্তু উনি সঙ্গে সঙ্গে আমার সে ভুল ভেঙে দিলেন। আঙুলের রসটা চাটতে চাটতে বললেন, আমরা পালা করে এক-একজন চব্বিশ ঘণ্টা অনশন করি। এগারো দিন পর পর আমার পালা আসে। এবার একদিন কমে গেল। একজন অসুস্থ, দশ দিন পর পর আমার পালা আসবে।

এবার আমি একটানা দুশো সতেরো দিনের অনশনের রহস্যটা বুঝলাম। দুশো সতেরো দিন ধরে সবাই না খেয়ে নেই। কিন্তু তাতেই বা কম কি? এগারো দিন পর পর চব্বিশ ঘণ্টা উপোস। আমি তো কোন একটা দিনও পুরো না খেয়ে থাকার কথা ভাবতে পারি না!

জ্যাঠামশাইয়ের এগারো দিন পর পর উপোস। আর এ বাড়ির সব লোক? তারা বোধহয় সারা বছরই অর্ধাশনে থাকে।

বিদায় নিয়ে সিঁড়িতে পা দিলাম। জ্যাঠামশাই বললেন, আবার আসিস। শিগগির শিগগির আসিস। বেশি দেরি করলে হয়তো আর আমাদের দেখতেই পাবি না।

আমি ঘাড় হেলিয়ে নিপুণ অভিনেতার মতন হাসিমুখে বললাম, আসব, নিশ্চয়ই আসব।

জ্যাঠাইমা কিছুই বললেন না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন শুধু।

ছন্দা নামের মেয়েটি আমার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল নিচে। উঠোনটা পার না হওয়া পর্যন্ত সে কোন কথাই বলল না।

সদর দরজার কাছে এসে সে বলল, ছোড়দা শুনুন!

ও আমাকে ছোড়দা বলল কেন? বোধহয় শুনেছে, আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে আমি ছোট। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম।

ম্লান, বিষণ্ণ মুখ। শাড়িটি অতি ময়লা। তবু ওর চেহারার মধ্যে একটা আলগা লাবণ্য আছে। চোখ দুটো সুন্দর।

—কী?

—ছোড়দা, আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেবেন?

আমার একটু হাসি পেল। মেয়েটি জানে না, আমি নিজেই বেকার। আমিও চাকরি খোঁজার দলে, চাকরি দেওয়ার দলের মানুষ নই। কিন্তু সে কথাটা একে এখন বলে লাভ নেই।

—তুমি কী চাকরি করবে?

—যে-কোন চাকরি! আপনাদের তো অনেক জায়গায় চেনাশুনো, যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন, যে-কোন কাজ আমি পারব—আমি এ বাড়ি থেকে চলে যেতে চাই!

মেয়েটি কথা বলছিল তীব্র ব্যাকুলতার সঙ্গে। যেন এই মুহূর্তে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত! খানিকটা আগে আমি নিজের কানেই তো শুনেছি, ওর বাবা ওকে মরতে বলেছিল।

ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়া একটি যুবতী মেয়ে কী ধরনের চাকরি পেতে পারে, আমার তা জানা নেই। তাকে স্বাধীন হয়ে ভদ্রভাবে বাঁচবার সুযোগ কি কেউ দেবে?

তবু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আমি দেখব, নিশ্চয়ই খোঁজ করব, যদি কিছু পাই তোমাকে জানিয়ে যাব!

—ঠিক?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!

—আপনি ভুলে যাবেন না?

—না, না।

—ছোড়দা, আমার ভীষণ দরকার, যে-কোন চাকরি, আপনি দয়া করুন, আপনি আমাকে জোগাড় করে দিন।

—আমি খোঁজ করব...পেলেই—

—কবে?

—তা তো জানি না, ইয়ে...মানে...আমার হাতে তো কিছু নেই, চেনাশুনোদের কাছে জিজ্ঞেস করে—

—আমি আর বেশিদিন থাকতে পারব না...এখানে...আপনি জানেন না, এমন অবস্থা...আপনি দয়া করে একটা কিছু—

—পেলেই তোমাকে জানাব।

রাস্তা পেরিয়ে ওপাশে বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়িয়েও দেখলাম, ছন্দা আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

৪

পূর্ণিয়ার জমিদারের দার্জিলিং-এর বাড়ি থেকে আমরা মাত্র তিনখানা বই চুরি করেছিলাম। আসল বইটাই রেখে আসতে হয়েছিল। ওঁরা এমন ভালো ব্যবহার করেছিলেন যে চক্ষুলজ্জায় আর বেশি কিছু নিতে পারিনি। যাই হোক, সেবারে আমাদের অভিযান তেমন সার্থক হলো না।

একদিন সকালে দেবরাজ আমার বাড়িতে এসে বলল, চল, ঘুরে আসি।

আমি জানি ও কোথায় যেতে চায়। এটা কলকাতার বাইরে কোথাও নতুন কোন অভিযানের প্রস্তাব নয়। দেবরাজের মঙ্গোলীয়ান ছাঁচের মুখ, তাতে ভাবান্তর বোঝা যায় না। কিন্তু চোখ দুটোতে ঝকঝক করে বুদ্ধির ছাপ।

আমি বললাম, তাহলে আগে সুজিতের কাছে যাই। ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে তো!

দেবরাজ বলল, তার কী দরকার? আমাদের তো যাবার জন্য নেমন্তন্নই করেছে।

—তা করেছেন ঠিকই। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো ভালো করে আলাপ-পরিচয় হয়নি। সুজিত সঙ্গে থাকলে সুবিধে হবে।

—না, না, তুই বুঝিস না। এসব ক্ষেত্রে নিজেরা আলাপ করতে পারলেই বেশি সুবিধে। সুজিতকে আর এর মধ্যে টানবার দরকার নেই!

আর প্রতিবাদ করলাম না। এই ব্যাপারে ট্যাকটিকস দেবরাজ আমার থেকে অনেক ভালো বোঝে।

কয়েকখানা দুর্লভ বই বিক্রি করে দেবরাজের হাতে কিছু টাকা আছে। বাড়ি থেকে বেরিয়েই ও ঝপ করে একখানা ট্যাক্সি নিয়ে ফেলল। প্রথম গেলাম কলেজ স্ট্রিটের একটা দোকানে। সেখানে মধুবনী পেইন্টিং বিক্রি হচ্ছিল শস্তায়। দু'খানা ছবি কিনে ফেলল দেবরাজ। টাকা চব্বিশেক খরচ হলো এতে। মুচকি হেসে ও বলল, যত বড়লোকই হোক, কিছু উপহার পেলে সবাই খুশি হয়। আমি গিয়ে সুনয়নী দেবীকে বলব, গত সপ্তাহে আমি দারভাঙ্গায় গিয়েছিলাম, সেখান থেকে আপনার জন্যই এই ছবি দুটো কিনে আনলাম। তুই কিন্তু কিছু ফাঁস করে দিস না!

আমি অবাক হয়ে বললাম, সুনয়নী দেবী, কে?

—কেন, সুজিতের শাশুড়ি।

—ওঁর নাম সুনয়নী দেবী কে বলল?

—ভদ্রমহিলার ঐ নাম নয়? কিন্তু ভদ্রমহিলার চোখ দুটো দেখেই মনে হয়,

ওঁর নাম সুনয়নী দেবী হওয়াই উচিত! আমার তো ঐ মেয়েগুলোর বদলে ঐ ভদ্রমহিলারই প্রেমে পড়ে যেতে ইচ্ছে হয়। দেখে বোঝা যায় না কত বয়েস!

—সাবধান দেবরাজ!

ট্যাক্সি যাচ্ছিল শিয়ালদার দিকে। রোহিণী সিনেমার কাছাকাছি আসতেই আমি জানলা দিয়ে মুখ বার করে দেখলাম। ফুটপাথের ওপর অনশনকারীরা আজও বসে আছে। দুশো ছাব্বিশ দিন। আজ রমেশ জ্যাঠামশাইকে দেখলাম, সামনেই বসে আছেন, গলায় একটা ফুলের মালা। আজ বোধহয় ওঁর অনশনের দিন।

—কী দেখছিস?

—কিছু না।

দেবরাজ একটা শুভ কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। এই সময় কোন জটিল সমস্যার কাহিনী ওকে শোনাবার কোন মানে হয় না। তাছাড়া আর তো কেউ এই অনশনকারীদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। নেহাৎ আমার সঙ্গে ওঁদের একজনের চেনা আছে বলেই একটু জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

বাড়ির নম্বর মুখস্থই ছিল দেবরাজের। নিউ সি আই টি রোডে একটা মস্ত বড় বাড়ি। বাড়ির সামনে কোলাপসিবল গেট। দোতলার সব বারান্দাও পুরোপুরি গ্রিল দিয়ে ঢাকা। বাড়িটার চেহারায় একটা দুর্গ দুর্গ ভাব আছে।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আমরা গেটের কাছে এগিয়ে গেলাম। ভেতরে টুলের ওপর দারোয়ান বসে আছে। ঠিক অফিস-টফিসের মতন শ্লিপে নাম লেখাতে হলো। আমাদের দু'জনের নাম লিখে ব্র্যাকেটে লিখে দিলাম সুজিতের বন্ধু।

নকশাল আন্দোলনের পর আজকাল আর ছেলে-ছোকরাদের কেউ বিশ্বাস করে বাড়িতে ঢুকতে দেয় না।

দারোয়ান গেট খুলে ভেতরের একটা ঘরে আমাদের বসাল।

ঘরের বাইরে দেয়ালে পেতলের প্লেটে অনেকগুলো কোম্পানির নাম লেখা। সুজিতের শ্বশুর তা হলে শুধু একটা সিনেমা হলেরই মালিক নন, আরো অনেক রকম ব্যবসা আছে। অধ্যাপকের পুত্র এখন ছোটখাট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। বাঃ, বেশ ভালো কথা। কে বলে, বাঙালির উন্নতি হচ্ছে না?

দারোয়ান এসে আমাদের অন্য একটি ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে টেবিলের এক পাশে অনেকগুলো চেয়ার। আর এক পাশে চামড়ায় মোড়া একটি চেয়ারে বসে আছেন মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক। চিনতে অসুবিধে হলো না, ছবিতে দেখেছিলাম আগে।

এসব ক্ষেত্রে দেবরাজই কথাবার্তা বলে। সে সংক্ষেপে জানাল, দার্জিলিং-এ কীভাবে ওঁর স্ত্রী ও মেয়েদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। এ বাড়িতে অনেক

বই আছে। আমরা সেগুলি একটু দেখতে চাই।

ভদ্রলোক সব শুনে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি বইয়ের ব্যবসা করেন?

উনি ব্যবসায়ী লোক, সুতরাং ঐ কথাটাই ওঁর প্রথম মনে এসেছে।

দেবরাজ অম্লান বদনে বলল, না। পুরোনো বই দেখা আমাদের নেশা। বিশেষত ইতিহাসের বই। আপনার বাবা বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর লেখা একটা বই...বাজারে এখন পাওয়া যায় না...এছাড়া ওঁর নিজের সংগ্রহের বইপত্র যদি একটু দেখা যায়—

শিবশঙ্কর লাহিড়ী এবার সোজা হয়ে বসলেন। মাথার স্বল্প চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, আমার বাবা সারা জীবন পড়াশুনো নিয়েই ছিলেন। টাকা-পয়সা যা পেতেন, সব দিয়ে বই কিনতেন। প্রচুর বই। আজকাল এত বই বাড়িতে রাখাই শক্ত। আমি পাঁচ রকম কাজে ব্যস্ত থাকি, ওদিকে মন দেবার সময় পাই না। চলুন, আপনারা যখন দেখতে চান—

উনি আমাদের নিয়ে উঠে এলেন দোতলায়। সিঁড়ির পাশেই আর একটি বসবার ঘর। তার পাশের ঘরের দরজা খুলে বললেন, এই যে দেখুন!

দেবরাজ বলল, এ কি!

ঘরের মধ্যে বইয়ের পাহাড়! আট-দশটি বড় বড় র‍্যাক ভর্তি বই তো আছেই, তা ছাড়া মেঝের ওপর গাদা করা প্রচুর বই, পা ফেলবার জায়গা নেই। বহু বই উল্টেপাল্টে ছড়িয়ে আছে!

বইয়ের অযত্ন দেখলে দেবরাজ সত্যিই খুব কষ্ট পায়। সে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধভাবে বলল, এ কি! এ যে বইগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সব!

শিবশঙ্কর লাহিড়ী বললেন, হুঁ, কিন্তু এত বই রাখবার জায়গা কোথায়? আমাদের দার্জিলিং-এর বাড়ি থেকে আবার আমার স্ত্রী কিছু বই নিয়ে এসেছেন। দুটো ঘরেও আঁটে না। দু'একজন বলেছিল, কিছু বই বিক্রি করে দিতে। কিন্তু আমার বাবার বই, এসব আমি বিক্রি করতে পারব না। অনেক কষ্ট করে তিনি এসব বই জোগাড় করেছিলেন। এখন বিক্রি করলে ক'টা টাকাই বা পাওয়া যাবে!

দেবরাজ বলল, এত বইয়ের দাম খুব কম হবে না...হাজার কয়েক টাকা।

শিবশঙ্কর লাহিড়ী সামান্যক্ষণ চিন্তা করে বললেন, নাঃ, দরকার নেই, বাবার বই আমি বিক্রি করতে চাই না। বরং বাবার স্মৃতিতে কোথাও যদি—

আমি বললাম, কোন লাইব্রেরিতে থাকলে তবু অনেক লোক পড়তে পারবে।

উনি বললেন, সেটা মন্দ না...বাবার নামে আলাদা আলমারি...সব বইতে বাবার নাম লেখা...এসব বই পড়বার মতন লোকই বা ক'জন আছে—

দেবরাজ সতর্কভাবে বলল, আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরির সঙ্গে কথা বলতে পারি। ওরা এত সব বই পেলে লুফে নেবে!

—তা দেখুন না ওদের সঙ্গে কথা বলে। আমার আপত্তি নেই।

—কিন্তু ন্যাশনাল লাইব্রেরি তো এরকম এলোমেলোভাবে বই নেবে না। আগে ক্যাটালগিং করতে হবে। এত বই ক্যাটালগিং করতে মাসখানেক লেগে যাবে!

—সেটা কারা করবে?

—যদি বলেন তো আমরা দু'জনেই এসে করে দিয়ে যেতে পারি।

—আপনারা করবেন? আপনাদের এত সময় আছে! আপনারা এমনিতে কী করেন?

—আমরা দু'জনেই হিস্ট্রিতে এম এ পাশ করে রিসার্চ করছি। আমরা বিকেলের দিকে এসে এ কাজ করে দিয়ে যেতে পারি। শুধু শুধু বইগুলো নষ্ট করার চেয়ে যদি লোকের কাজে লাগানো যায়—

দেবরাজ অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলে। এসব ব্যাপারে আমিও নিখুঁতভাবে ওকে সায় দিয়ে যাই। সুজিত থাকলে অসুবিধে হতো ঠিকই।

উনি কৌতূহলী চোখে আমাদের দু'জনকে দেখতে লাগলেন। টাকা-পয়সার প্রস্তাব না করেও যে কেউ এমনি এমনি কোন কাজের প্রস্তাব দিতে পারে, সেটা যেন উনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। সেই কথাটা মুখে বলেই ফেললেন। আপনারা এক মাস ধরে এসে খাটবেন, এতে আপনাদের স্বার্থ কী?

দেবরাজ বলল, আমাদেরও বই দেখা হবে। আমরা বই দেখতে ভালোবাসি।

—বেশ, ভালো কথা!

জানলাগুলো বন্ধ বলে ঘরটা অন্ধকার। আলো জ্বালা হলো। আমি বাইরের বারান্দায় চোরাভাবে দু'একবার উঁকি দিলাম। বাড়ির অন্য কারুকে তো দেখা যাচ্ছে না। বিশাখার সঙ্গে একবার অন্তত দেখা হবে না? যতদূর মনে হচ্ছে, এই ভদ্রলোক ওঁর স্ত্রী বা মেয়েদের ডাকবেন না!

দেবরাজ আমার অস্থিরতা বুঝেছিল। কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে রেখে বলল, আপনার স্ত্রীর জন্য এই ছবি দুটো উপহার এনেছিলাম।

শিবশঙ্কর লাহিড়ী ছবি দুটি দেখলেন। খুব একটা মুগ্ধ হলেন বলে মনে হলো না। খুব সম্ভবত সাহিত্য বা ছবিটবির সঙ্গে ওঁর কোন সম্পর্ক নেই।

উনি বললেন, ঠিক আছে, আমার স্ত্রীকে ডাকছি।

ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই দেবরাজ কয়েকখানা দামী বই ওর ঝোলার মধ্যে ভরে নিল। তীব্র হিংসার সঙ্গে বলল, ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে! এ বাড়ির সব বই আমি সাফ করে দেব!

আমি বললাম, তুই ন্যাশনাল লাইব্রেরির ভাঁওতাটা ভালো দিয়েছিস। ঐটা আরো চালিয়ে যা। সুজিতকে একটু টিপে রাখতে হবে।

একটু বাদে শিবশঙ্কর লাহিড়ী ফিরে এসে বললেন, উনি আসছেন। আপনারা ততক্ষণে বই-টই দেখুন। আমি নিচে যাচ্ছি, আমার কাছে অন্য লোক এসেছে।

দেবরাজ বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

বিশাখার মা এলেন একটু দেরি করে। চওড়া কাঁসো পাড়ের সাদা শাড়ি পরা। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। মিষ্টি হেসে বললেন, কী খবর? মনে করে ঠিক এসেছ তা হলে? খুব খুশি হয়েছি।

দেবরাজ এগিয়ে গিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, গত সপ্তাহে আমি দারভাঙ্গা গিয়েছিলাম, মধুবনী থেকে আপনার জন্য দুটি ছবি এনেছি।

—আমার জন্য?

—হ্যাঁ। মনে হলো, আপনার হয়তো ভালো লাগবে।

অলকা দেবী সত্যিই খুব অবাক হয়ে গেছেন। সুন্দর ভুরু দুটি তুলে বললেন, দারভাঙ্গা থেকে এনেছো? আমার জন্য? আমার কথা মনে ছিল তোমাদের?

দেবরাজ বলল, নীলু যায়নি। আমি একাই গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, আপনি দার্জিলিং-এ কথায় কথায় একটা পটের ছবির কথা বলেছিলেন...নিশ্চয়ই আপনি এই ধরনের ছবি ভালোবাসেন...

উনি ছবি দুটো খুলে দেখলেন। দুটি ছবিই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। মুগ্ধভাবে বললেন, বাঃ, কী সুন্দর! তারপর চোখ তুলে দেবরাজের দিকে তাকালেন। বেশ কয়েক মুহূর্ত সেই দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল। মনে হলো দেবরাজ আর তার 'সুনয়নী দেবী' যেন দৃষ্টিতে আবদ্ধ। ঠিক যেন প্রেমিক-প্রেমিকা। যদিও দেবরাজের বয়স ওঁর প্রায় অর্ধেক।

বিশাখার পাত্তা নেই। অন্য বোনেরাই বা কোথায়? সেকথা মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করা যায় না।

দেবরাজ বলল, বইগুলো আজ দেখে গেলাম। সামনের সোমবার থেকে সন্ধেবেলা আমরা দু'জনে আসব। বইগুলো এমন অযত্নে রেখেছেন? একটা ক্যাটালগ পর্যন্ত নেই। দেখুন এর মধ্যে এমন সব বই আছে, যার এমনিতে কোন দামই নেই বাজারে। কিন্তু যারা ঐসব সাবজেক্টে পড়াশুনো করে, তাদের কাছে ঐসব বই দারুণ দরকারী! এই সব বই নষ্ট করা অন্যায়।

উনি বললেন, ঠিকই তো! কিন্তু কে দেখবে বলো? আমার পক্ষে কী এত সব করা সম্ভব? চাকর-বাকরের হাতে ছেড়ে দিলে যা হয়! ওদের বলেছি, মাঝে মাঝে ধুলো ঝেড়ে সাফ করবে।

—কেন, আপনার মেয়েরা সাহায্য করতে পারে না?

—মেয়েদের এসব দিকে মনই নেই। ওদের মধ্যে বিশাখাই যা বই-টই পড়ে, মাঝে মাঝে নিয়ে যায় দু'একখানা পড়তে—কিন্তু সব যে গুছিয়ে রাখবে, সে ধৈর্য নেই। অন্য মেয়েরা বই-টইয়ের ধার ধারে না।

—আপনার বড় ছেলে?

উনি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আমার ছেলে এখানে থাকে না।

দেবরাজ তবু আবার জিজ্ঞেস করল, আপনার ছেলে এখানে থাকে না? বিদেশে থাকে?

এবার বিশাখার মা একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন বলে মনে হলো। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চাপা গলায় বললেন, আমার ছেলে কলকাতাতেই থাকে। কিন্তু এ বাড়িতে থাকে না। বাবার সঙ্গে তার ঝগড়া!

এইসব পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যে যে নাক গলানো উচিত নয়, সেটা এতক্ষণ বাদে বুঝতে পেরে দেবরাজ চুপ করে গেল। আমি মনে মনে বললাম, আপনার জামাইটিকেও আমি অনেকদিন ধরে চিনি। বইপত্র সম্পর্কে তারও বিশেষ আগ্রহ নেই!

উনি বললেন, সেই জন্যই ওঁকে অনেকবার বলেছি, বইগুলো নষ্ট না করে বিক্রি করে দিতে কিংবা কোথাও দান করে দিতে। তাও উনি দেবেন না। বাবার বই সম্পর্কে সেন্টিমেন্ট আছে।

দেবরাজ বলল, যাকে-তাকে হঠাৎ দান করে দেবেন না। দাঁড়ান, আমি আগে সব সাজিয়ে-টাজিয়ে দিই!

—সে তো খুব ভালো কথা। তোমরা যদি কষ্ট করে সাজাতে পারো—

আমরা কথা বলছিলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে, উনি আমাদের আর একটি ঘরে নিয়ে এলেন। এটাও বসবার ঘর, সোফা-কোচে সাজানো, সমস্ত আসবাবপত্রই অত্যন্ত মূল্যবান। এই নিয়ে এ বাড়িতে তিনটে বসবার ঘর দেখলাম। নিশ্চয়ই ওপরে আরো একটি আছে, যে-ঘরে টেলিভিশান। একই বাড়িতে চারখানা বসবার ঘর, অথচ বইগুলো দুটো ঘরের মধ্যে ডাঁই করা। তা তো হবেই, বই এখন এ বাড়িতে অপ্রয়োজনীয় বস্তু। অধ্যাপকের পুত্র ব্যবসায়ী। দেবরাজ খুব ভালো জায়গার সন্ধান পেয়ে গেছে—আর অনেকদিন বাইরে বাইরে জমিদার বাড়ি খুঁজে খুঁজে ঘুরতে হবে না।

বেয়ারা ট্রেতে সাজিয়ে প্রচুর রকম খাবার ও সরবৎ নিয়ে এল। বিশাখার মা খুব খাওয়াতে ভালোবাসেন লোকজনদের, সেকথা আগেই বুঝেছি। আপত্তি

জানিয়ে লাভ নেই, আমি খাবারে মনঃসংযোগ করলাম। দেবরাজ ভোজনরসিক। সে প্রতিটি খাবারের বেশ তারিফ করতে লাগল। তারপর বলল, দেখুন, সোমবার থেকে যে রোজ সন্ধেবেলা আসব, তখনও কি রোজ আমাদের এরকম খেতে দেবেন?

বিশাখার মা হেসে ফেলে বললেন, আহা, এ আর এমন কী! লোকের বাড়িতে লোকজন এলে কিছু-না-কিছু তো দেয়!

দেবরাজ বলল, বেশ, ভালো কথা! তাহলে প্রত্যেকবার এতগুলো করে মিষ্টি খাওয়াবেন না! কিছু নোনতা খাবার বা মাংসের চপটপও দেবেন।

—তুমি বুঝি মাংস ভালোবাসো।

—শুধু আমি কেন, আমার চেয়েও আমার বন্ধুটি! বাঘের মতন মাংস ভালোবাসে!

—কিসের মতন?

—বাঘের মতন। মাংস দেখলেই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমি দেবরাজের দিকে চোখ পাকালাম। কিন্তু ওরা দু'জনে হাসতে লাগল খুব। যেন ওরা দু'জনে একদলে, আর আমি আলাদা।

—ঠিক আছে, আমি নিজে তোমাদের জন্য চপ বানাবো।

বুঝলাম, দেবরাজ রীতিমতো জমিয়ে নিচ্ছে ওঁর সঙ্গে। কোন মহিলার কিসে দুর্বলতা, সেটা ও ঠিক বুঝে নেয়। যাকে বলে ফিল্ড ক্রিয়েট করা, তার জন্য ওর বেশি সময় লাগে না।

বাড়িতে আর কারুর কোন সাড়া-শব্দ নেই। আমি বেশ নিরাশ হয়ে পড়ছিলাম। দেবরাজের দিকে চোখের ইঙ্গিত করে বললাম, আজ উঠতে হবে, আজ আমার একটু কাজ আছে।

বিদায় নিয়ে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। বিশাখার মা বললেন, তা হলে তোমরা সোমবার থেকে আসছ? খুব ভালো হবে, সুজিতও থাকবে—ও প্রায়ই সন্ধেবেলা একবার করে আসে...

সুজিত উপস্থিত থাকলে আমাদের কাজের খুব একটা সুবিধে হবে না। দেবরাজ সেইজন্যই সঙ্গে সঙ্গে জানাল, আমরা মাঝে মাঝে দুপুরের দিকেও আসতে পারি, তাহলে একসঙ্গে অনেকক্ষণ কাজ করা যায়।

বিশাখার মা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এস, তোমাদের যখন সুবিধে হয়।

উনি নিচে এলেন না। দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরা নেমে এলাম একতলায়। দেবরাজ বলল, ভদ্রলোকের সঙ্গেও একবার দেখা করে যাওয়া উচিত।

ওই ঘরের বাইরে আমরা দাঁড়ালাম। ভেতরে উত্তেজিত কথাবার্তা হচ্ছে। বিশাখার বাবা বেশ জোরে জোরে কথা বলেন। উনি কাকে যেন বলছেন, আরে মশাই, আপনার ছবির রিলিজ হচ্ছে না তো আমি কী করব? ও স্ট্রাইক আমি এখন মেটাব না। এক বছর দু'বছর কতদিন ওরা চালাতে পারে আমি দেখব! ওদের মধ্যে দুটো হারামজাদাকে আমি ছাঁটাই করবই। এমন নিমকহারাম, জানেন, ওদের মধ্যে একজন, রমেন যার নাম, বোনের বিয়ে দিতে পারছিল না, সম্বন্ধ হয়ে গেছে, টাকা নেই, আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ল। আমি এক কথায় দু' হাজার টাকা দিয়ে দিলাম, অ্যাডভান্স নয়, এমনিই, বলে দিলাম, বিয়ের যৌতুক! সেই লোকই কিনা বোনাসের দাবি নিয়ে এসে আমার মুখের ওপর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে! কত বড় নিমকহারাম! সেই লোককে আমি রাখব!

—আপনি হলটা কাংকারিয়াকে লীজ দিয়ে দিন না! উনি তো কতবার ইন্টারেস্ট দেখিয়েছেন।

—কাংকারিয়া চালাতে পারবে?

—ওরা ঠিক পারে। ওদের ব্যবসা চালাবার কায়দাই আলাদা!

—আমার চালু ব্যবসাটা আমি মাড়োয়ারির হাতে তুলে দেব? এই বলতে চান?

কে যেন একজন বলল, কিন্তু এতদিন বন্ধ রেখে আপনার মেশিনপত্তর সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাতে কিন্তু অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

উনি বললেন, হোক ক্ষতি। ঐ হলের টাকায় আমার হাঁড়ি চড়ে না। আমার আর পাঁচটা ব্যবসা আছে। ওরা বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমি সিনেমাহলই তুলে দেব। ঐ জমিতে মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং বানিয়ে ভাড়া দেব।

আমরা বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এই সময় ঘরে ঢোকা উচিত কিনা বুঝতে পারছি না। ওপর থেকে বিশাখার মা বললেন, তোমরা ওঁর সঙ্গে কথা বলবে? যাও না, ভেতরে চলে যাও।

আমরা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললাম, আমরা আজ যাচ্ছি, সোমবার থেকে আসব।

বিশাখার বাবার মুখখানা রাগে গনগন করছে। আমাদের দেখে সেই রাগত মুখেই কোনক্রমে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বললেন, ও আচ্ছা। ঠিক আছে, আসবেন, ইয়ে এসো, নিশ্চয়ই এসো।

আমরা ওঁর জামাইয়ের বন্ধু তো, তাই আমাদের একটু বিশেষ খাতির দেখাবার জন্য উনি উঠে এসে আমাদের দু'জনের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন।

রোহিণী হলের সামনে অনশনের ব্যাপারটা না জানলে আমি হয়তো শিবশঙ্কর লাহিড়ীকে অপছন্দ করতাম না। মানুষটির মধ্যে বেশ একটা উষ্ণ ব্যক্তিত্ব আছে।

নিছক একজন অধ্যাপকের পুত্র হয়েও তিনি যথেষ্ট উন্নতি করেছেন জীবনে। বাঙালিরা ব্যবসা-বাণিজ্যে আজকাল দাঁড়াতে পারে না বলে আমরা দুঃখ করি। এই তো একজন সার্থক বাঙালি!

রাস্তায় বেরিয়ে আসবার পর দেবরাজকে জিজ্ঞেস করলাম, কী কী বই আনলি? দেখি।

দেবরাজ বলল, সব ফাঁক করে দেব। ন্যাশনাল লাইব্রেরিকেও দেব কিছু, বাকিটা আমাদের থাকবে। দেখবি?

দেবরাজ ব্যাগের মুখ খুলে বইগুলো আমাকে দেখাতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নিজেই আবার ব্যাগটা বন্ধ করে আমাকে একটু ঠেলে দিয়ে বলল, চুপ, এখন না, পরে।

উল্টো দিক থেকে রাস্তা পার হয়ে আসছে বিশাখা।

আমি জামার কলার ঠিকঠাক করে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। ও প্রথমে আমাদের দেখতে পায়নি। এরকম কিছু মেয়ে আছে, যারা রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটে তখন কোন মানুষকেই দেখতে পায় না। অন্যরা সবাই তাদের দেখে কিন্তু তারা কারুর চোখে চোখ ফেলে না। অনেক মেয়ে চেনা লোকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলেও কথা বলে না। মেয়েদের যে কতরকম কায়দা। বিশাখা যদি আমাকে দেখতে না পায়, তাহলে আমি ওকে ডাকব না।

আমি মনে মনে বললাম, ব্যস্ততার তো কিছু নেই। এখন থেকে তো ওদের বাড়িতে নিয়মিত আসব। দেখা হবেই। আমার প্রত্যেকটি হৃৎস্পন্দন যেন বলছিল, দেখা হবেই, দেখা হবেই।

একেবারে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বিশাখা হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল। অমনি মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে গেল হাসিতে। বলল, আরেঃ, এদিকে কোথায় এসেছিলেন?

দেবরাজ বলল, তোমাদের বাড়িতেই তো গিয়েছিলাম।

উত্তরটা দেবরাজ দিলেও বিশাখা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, সত্যি? সত্যি গিয়েছিলেন?

দেবরাজ আবার বলল, হ্যাঁ, এই তো এইমাত্র এলাম। তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ হলো—তোমাদের বাড়ির বইগুলো দেখলাম—

আমি কথা বলতে পারছিলাম না। আমার বুক কাঁপছিল। সব মেয়েদের দেখেই যে আমার বুক কাঁপে, তা নয়। কিন্তু এই মেয়েটি আমার লেখার প্রশংসা করেছিল। এরকম একটি সুন্দরী মেয়ে আমার লেখা পড়ে। শুয়ে শুয়ে পড়ে? বুকের ওপর আমার বইখানা রেখে? কোনদিন কি ও আমার কোন লেখা পড়ে কেঁদেছে?

বিশাখা বলল, কেন আগে থেকে খবর দেননি। আমি তাহলে থাকতাম। চলুন, আবার চলুন।

আমি বললাম, আজ অনেকক্ষণ ছিলাম। আবার আসব।

দেবরাজ বলল, এই সোমবারেই সন্ধেবেলায় আমরা আবার আসছি।

এবারেও বিশাখা আমার চোখে চোখ রেখে বলল, ঠিক আসবেন তো? আমার কয়েকজন বন্ধুটন্ধুকে বলে রাখব তাহলে। আমার এক বন্ধু তো বিশ্বাসই করতে চায় না যে আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে।

আমি বললাম, বেশি লোকজন দেখলে কিন্তু আমি ঘাবড়ে যাই! ঠিক মতন কথাই বলতে পারি না।

বিশাখা বলল, বেশি নয়, দু-তিনজন। ঠিক আসবেন?

হ্যাঁ, আসব।

—আমার এক বন্ধু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বলেছে। সেই যে আপনি একটি ফরাসী মেয়ের কথা লিখেছেন, মার্গারিট, সত্যিই সেরকম কোন মেয়ে ছিল? না বানিয়ে লিখেছেন?

—আমি তো কিছু বানিয়ে লিখতে পারি না।

—সব নিজের অভিজ্ঞতা?

—সব!

বিশাখা মিষ্টি করে হেসে বাড়ির দিকে চলে গেল। লোহার গেট খুলে ভেতরে ঢুকে হাত তুলে হাসলো আর একবার।

আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বড় বড় নিশ্বাস পড়ছে। বিশাখার প্রতি একটা গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ জেগে উঠল আমার মনে। সে আমাকে অগ্রাহ্য করলেও তো বলার কিছু ছিল না। সব মেয়েরাই তো এরকম দয়ালু হতে পারে।

দেবরাজ বলল, মেয়েটা তোকে বেশ পছন্দ করে ফেলেছে মনে হচ্ছে। তাকানো-টাকানোগুলোই অন্যরকম।

আমি বললাম, কেন, তোর হিংসে হচ্ছে নাকি?

—হিংসে হতে যাবে কেন? কিন্তু তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না।

—কী হবে না!

—তুই ভ্যাবলার মতন দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ভালো করে কথাটথা বলবি তো।

—যা, যা, তোকে আর শেখাতে হবে না মেয়েদের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয়!

—তুই মেয়েটাকে এক মাসের মধ্যে চুমু খেতে পারবি? বাজি ধরবি? কত টাকা?

—তোর সামনে, তোকে দেখিয়ে দেখিয়ে চুমু খেতে হবে নাকি?

—তার দরকার নেই। তোর যেখানে খুশি, একবারও যদি চুমু খেতে পারিস, জোর করে নয়, বেশ প্রেমের সঙ্গে—এসে আমাকে বলবি। আমি ঠিক সত্যি-মিথ্যে বুঝতে পারব—একশো টাকা বাজি রইল।

৫

প্রথম দিন রমেশ জ্যাঠার বাড়িতে গিয়ে গোড়ার দিকে আমার মনে হয়েছিল, উনি জীবনে কখনোই ভালো মতন উপার্জন করতে পারেননি, তবু এতগুলো ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছেন কেন? মানুষ করার সামর্থ্য না থাকলে ছোট ছোট শিশুদের পৃথিবীতে আনা অন্যায়। কিন্তু যারা জন্মে গেছে, তাদের ওপর রাগ করা যায় না। রমেশ জ্যাঠার চার মেয়ে, এক ছেলে। দুটি মেয়েকে সেদিন দেখেছি, বড় দুঃখী মুখ।

বিশাখার চার বোন, এক ভাই। ওরা সবাই সুন্দর। ওদের দেখে একবারও মনে হয় না, শিবশঙ্কর লাহিড়ী কেন ফ্যামিলি প্ল্যানিং মান্য করেননি। বরং মান্য করলেই এ পৃথিবীর মহা ক্ষতি হয়ে যেত। বিশাখার মতন একটি মেয়ে হয়তো জন্মাতই না।

অনেকদিন আগে আমি 'ক্র্যাক ইন দ্যা মীরর' নামে একটি বিদেশী ফিল্ম দেখেছিলাম। সেখানে ছিল সমাজের খুব উঁচু স্তরের আর খুব নিচু স্তরের দুটি পরিবারের কাহিনী, ঠিক একরকম। আজ সকালে হঠাৎ সেই ফিল্মটার কথা মনে পড়ে গেল। রমেশ জ্যাঠামশাই আর শিবশঙ্কর লাহিড়ীর পরিবার দুটিও কিন্তু একই রকম। কিছু সমস্যাও এক ধরনের। এই মিলটা খুঁজে পেয়ে আমি বেশ কৌতুক বোধ করলাম।

রমেশ জ্যাঠা তাঁর বড় ছেলে সম্পর্কে সঠিক খবর রাখতেন না। তাঁর ছেলে হারাণকে খুব ছেলেবেলায় আমি দেখেছি কিনা মনে নেই, পরবর্তীকালে তার সঙ্গে আমার আর চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেনি। কিন্তু এই কাহিনীতে সে-ই অনেকখানি অতি-নাটকীয় উপাদান এনে দেয়। তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে পরে জেনেছি।

স্কুলে পড়ার সময় ক্লাস সিক্স পর্যন্ত হারাণ ছিল একজন অতি নিরীহ, সাধারণ

ছেলে। তার কোনরকম বৈশিষ্ট্য কারুর নজরে পড়েনি। সে ছিল একটি রোগা-পাতলা বালক। প্রায়ই তার সারা গায়ে পাঁচড়া হতো। এমনকি তার মাথার মধ্যে পাঁচড়া হতো বলে, তার মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হতো মাঝে-মধ্যেই। তখন স্কুলের ছেলেরা বেশি মার খেত। রোগা আর ন্যাড়া মাথা ছেলেরা আরো বেশি মার খেত।

ক্লাস এইট-এ উঠে সে পর পর দু'বার ফেল করে। এমনকি বেলেঘাটার রিফিউজি স্কুলেও পর পর দু' বছর ফেল করা ছাত্রকে রাখবার নিয়ম নেই। তার বাবার কাছে চিঠি যায়, ছেলেকে অন্য স্কুলে ট্রান্সফার নেবার জন্য। কিন্তু ঐ স্কুলের চেয়েও খারাপ কোন স্কুল সেই এলাকায় ছিল না। তার বাবা অবশ্য তাকে অন্য কোথাও ভর্তি করবার চেষ্টাও করেনি। বরং ছেলের পড়াশুনোয় অমনোযোগের খবর হঠাৎ একদিন জানতে পেরে পায়ের চটি খুলে বেধড়ক পেটালেন। হারাণের মা বাধা দিতে এসেও মার খেলেন কয়েক ঘা। মার খেয়ে হারাণ প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল।

এই মার খাবার ফলেই কিনা কে জানে, হারাণের টাইফয়েড হলো দু'দিন বাদে। সেই অসুখে ভুগলো দেড় মাস। পাড়ার একজন এল-এম-এফ ডাক্তার তাকে দেখেছিলেন মাত্র তিনবার! হারাণের বেঁচে ওঠার কোন কথাই ছিল না, তাকে ঠিক মতন ওষুধ খাওয়ানো হয়নি, সে নানারকম কুখাদ্য গিলেছে, তবু কোন এক অদ্ভুত জীবনীশক্তি-বলে একদিন সে ঠিক সেরে উঠল এবং ভাতের জন্য ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল।

শুধু তাই নয়, টাইফয়েডের পর থেকে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এল হারাণের মধ্যে। হঠাৎ সে লম্বা ও চওড়া হতে লাগল। ঠিক যেন একটা রবারের পুতুলকে ফুঁ দিয়ে ফোলানো হচ্ছে। দেখতে দেখতে সেই রোগা-পাতলা, গায়ে পাঁচড়াওয়ালা ছেলেটি হারিয়ে গেল কোথায়। ঠিক সেই সময়েই বিক্রি হয়ে গেল রমেশ জ্যাঠার ক্যামেরার দোকানটি। হাতে কিছু কাঁচা পয়সা আসায় বাড়িতে কিছুদিন বেশ ভালো খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল। আবার একটা কিসের ব্যবসা করবেন, এই কথা ভাবতে ভাবতেই ফুরিয়ে গেল রমেশ জ্যাঠার হাতের সব টাকা।

লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্য নিয়ে হারাণ নিজেই তার পুরোনো স্কুলে গিয়েছিল আবার ভর্তি হতে। বিনা আপত্তিতে তাকে ভর্তি করে নেওয়া হয়, স্পোর্টসম্যান হিসেবে। প্রতিবার ফেল করেও সে ক্লাস টেনে ওঠে। তারপর স্কুলটাই উঠে যায়। বেলেঘাটায় অনেক নাগরিকের এখনো মনে আছে যে, হেমনলিনী বিদ্যাভবনটি একদিন আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। স্কুলটি ছিল ভাড়া বাড়িতে। পরে সেখানে আবার নতুন বাড়ি ওঠে কিন্তু সেটি ভাড়া দেওয়া হয় একটি ব্যাঙ্ককে।

ব্যাঙ্কটি সগৌরবে এখনো বিরাজমান।

ক্লাস টেনের ছেলেদের কাছাকাছি বিভিন্ন স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা দেওয়ানো হয়। সেইবারই প্রথম আমাদের হারাণচন্দ্র আর তিন চারজন ছেলের সঙ্গে মিলে পরীক্ষার হলে গার্ডকে ছুরি দেখায়।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে সে আর বসেনি, কারণ সামনেই ছিল ইলেকশান। হারাণ ভিড়ে গেল এক দলে। তখন হারাণের বয়েস উনিশ। সে একদিন অত্যাশ্চর্য কাণ্ড করল, সে তার দুঃখিনী মায়ের হাতে একশো টাকা তুলে দিল। তার নিজের রোজগার।

ভোট উপলক্ষেই হারাণের মাথা ফাটে। ফলে পাড়ার ছেলেদের মধ্যে তার নাম রটে যায়। মাথায় পেট্টি বাঁধা অবস্থায় সে একটা জিপ গাড়িতে চেপে ঘোরে। চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সে সগর্বে বলে, আমার মাথা ফাটাবার আগে, শালা, আমি ওদের দুটো লাশ ফেলে দিয়েছি। তারপর থেকে ছেলেরা সম্মান করে তাকে ডাকে হ্যারাণদা।

শেষের দিকে দু'বছর হারাণ বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকতে শুরু করে। বাবা-মায়ের আন্ডারে বেশিদিন থাকলে দলের ছেলেদের কাছে প্রেস্টিজ থাকে না। তা ছাড়া ছাব্বিশ বছর বয়েসেই তার দু-দুটো বাঁধা মেয়েছেলে। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে কোন অ্যাংলো মেয়ের ঘরে গিয়ে সে এক রাতে দুশো-আড়াইশো টাকা খরচা করার হিম্মৎ রাখে।

হারাণের বোনেরা ক্বচিৎ কখনো রাস্তায় দাদাকে দেখতে পেলেও কথা বলে না। মুখ নিচু করে চলে যায়। একদিন মাতাল অবস্থায় বাড়ি এসে মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল বলে রমেশ জ্যাঠামশাই হারাণকে জুতো পেটা করেছিলেন। হারাণ তখন নিজের বাবাকে ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছিল হারামী। এদিকে রমেশ জ্যাঠা তো অনবরত হারাণকে শুয়োরের বাচ্চা বলছিলেনই। ফলে, নানা রকম গোলমালের সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়াল। হারাণ অনেকবার রুখে দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত গায়ে হাত তোলেনি। নেহাৎ বাবা বলেই ছেড়ে দিয়েছে। নইলে অমন বুড়ো ফুড়ো লোককে সে এক ঝটকায় শেষ করে দিতে পারত। যাই হোক, রমেশ জ্যাঠা সেই থেকে ঘোষণা করেছিলেন, আর কোনদিন ঐ ছেলেকে বাড়িতে দেখতে পেলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। তবু মাঝে-মাঝে স্যাঙাতদের হাত দিয়ে হারাণ তার মায়ের কাছে কিছু টাকা পাঠিয়েছে। বছরখানেক ধরে অবশ্য তার দিক থেকে কোন সাড়া-শব্দ ছিল না। যে পার্টির হয়ে সে বেশি কাজ করত, রাজনৈতিকভাবে সেই পার্টির খুবই বে-কায়দা অবস্থা। মাস চারেকের মধ্যেই সে পার্টি বদলে ফেলে অবশ্য।

রমেশ জ্যাঠামশাই আমাকে বলেছিলেন, তাঁর ছেলে জেলে রয়েছে। কিন্তু সেকথা সত্যি নয়। তিনি সঠিক খবর জানতেন না। হারাণ আট মাসের বেশি জেলে থাকেনি। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে যখন নকশালবন্দীরা একদিন পালাল, সেদিন কিছু সাধারণ কয়েদীও টুকটাক করে সরে পড়েছিল। হারাণ ছিল সেই দলে। নকশালবন্দীদের জেল ভাঙার খবর তখন কোন কাগজেই ছাপা হয়নি, সুতরাং হারাণের পালাবার কথাও কারুর জানার কথা নয়। পালাতে গিয়ে হারাণ ডান পায়ে বেশ জোরে চোট খায়। সেই অবস্থায় সে ঝাঁপিয়ে পড়ে আদিগঙ্গায়। একটুর জন্য সে গুলি খেয়ে মরেনি। ওপারে এসে, নকশালদের জন্য অপেক্ষমান ট্যাক্সিগুলির একটিতে সে জোর করে উঠে পড়ে, চলে যায় ডায়মণ্ডহারবার। সেখানে নকশালপন্থীরা তাকে পরিত্যাগ করল। কারণ, জেলের মধ্যেও সে নকশালদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে বেশ কয়েকবার। পালাবার সময় সে ওদের দলে ভিড়বার জন্য কাকুতি মিনতি করলেও ওরা পছন্দ করেনি তাকে।

এইবার হারাণ একটু অসুবিধেয় পড়ল। আহত গুণ্ডার হাতে যদি বেশ কিছু টাকা-পয়সা না থাকে তাহলে তার অবস্থা খুব করুণ হয়। হারাণ কোন পরিকল্পনা করে জেল থেকে পালায়নি, সে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে এবং ডায়মণ্ডহারবারে তার বিশেষ কোন যোগাযোগও নেই। তাছাড়া গুণ্ডাদের এলাকা ভাগ করা থাকে। এক পাড়ার গুণ্ডা বিনা নোটিসে অন্য পাড়ায় যেতে পারে না। বনে-জঙ্গলে যেখানে মোষের পাল থাকে, সেখানে একটা তাগড়া মোষ থাকে, যাকে বলে ব্রিডিং বাফেলো, সে নিজস্ব এলাকা ছেড়ে সহজে যায় না, আর সেই এলাকায় অন্য কোন ব্রিডিং বাফেলোকে ঢুকতেও দেয় না। গুণ্ডাদের মধ্যেও সেই নিয়ম।

রাত্তিরটা হারাণ ঘাপটি মেরে পড়ে রইল গঙ্গার ধারে। গরম কাল। গঙ্গার ধারে শুয়ে বেশ আরাম পাবারই কথা, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার ভয়ে সে কাপছিল ঠকঠক করে। তার ডান পায়ে এত ব্যথা যে সম্ভবত হাড়ই ভেঙেছে, দৌড়োবার ক্ষমতা নেই। আর যে-গুণ্ডা দৌড়োতে পারে না, তার দাম কানাকড়ি। পুলিশের হাতে আবার ধরা পড়লে যে প্রচণ্ড মার খেতে হবে, সেই চিন্তাটাই তার প্রবল।

পরদিন দুপুরের দিকে সে প্রায় মরিয়া হয়ে খুঁজে বার করল স্থানীয় এক আধা পরিচিত মাস্তানকে। এবং তার পা জড়িয়ে আশ্রয় চাইল কয়েক দিনের জন্য। মাস্তানটি বলল, জায়গাটা খুব 'গরম' হয়ে আছে। এখানে থাকলেই হারাণ ধরা পড়ে যাবে। সে হারাণের হাতে পঁচিশটা টাকা গুঁজে দিয়ে তুলে দিল কাকদ্বীপের বাসে। এবং একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিল হারাণকে। হারাণ এই অবস্থায় বেশিদিন পালিয়ে থাকতে পারবে না। এখন তার উচিত হচ্ছে, কাকদ্বীপ বা

নামখানার দিকে গিয়ে কোন মেয়ের গলার হার ছিনিয়ে নেওয়া কিংবা মিষ্টির দোকানের ক্যাশ বাক্স তুলে নেওয়ার মতন কিছু একটা পেটিকেস করে ইচ্ছে করে পুলিশের হাতে ধরা দেওয়া। সেখানে নাম ভাঁড়িয়ে হাজতে থাকুক কিছুদিন। তাহলে কলকাতার পুলিশ আর কিছুতেই তাকে খুঁজে পাবে না।

হারাণ এ পরামর্শ শুনল না। তার পা ভাঙা বলেই সে পুলিশের হাতে মার খাওয়ার ভয় পাচ্ছে সাঙ্ঘাতিক। কাকদ্বীপে গিয়ে সে খুঁজে পেল হীরুচাঁদকে। এর সঙ্গে একবার সোনারপুরে হারাণ একটা মিটিং ভাঙার কেস করেছিল। হীরুচাঁদ আশ্রয় দিল একটা চায়ের দোকানের পেছনের অন্ধকার ঘরে। সেখানে প্রচণ্ড খিদে, জ্বর, পায়ের ব্যথা নিয়ে প্রায় বেহুঁস অবস্থায় সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, মা, মা, মা!

সেই টাইফয়েডের পর আবার এই প্রথম হারাণ অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। এবারেও সে ছেলেমানুষের মতন যন্ত্রণার ঘোরে মায়ের নাম ধরে কাঁদতে লাগল।

আট ন' মাস জেলে থাকার জন্য হারাণ তার বাড়ির খবর কিছুই জানে না। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে অনেক কয়েদীর কাছেই মাসে একবার অন্তত কোনো-না-কোন আত্মীয়স্বজন আসত। হারাণের কাছে কেউ কখনো আসেনি। হারাণ জানতেও পারেনি, তার বাবা রোহিণী সিনেমা হলের সামনের ফুটপাতে না খেয়ে বসে থাকে।

হারাণ জেল থেকে পালাবার তিনদিন পর রাত দুটোর সময় তিন গাড়ি পুলিশ বেলেঘাটায় রমেশ মুখার্জির বাড়ির সামনে এসে থামল। রমেশ মুখার্জি তখন বাড়ি নেই, তাঁর সেদিন চব্বিশ ঘণ্টা অনশনের ডিউটি। পুলিশ একতলার ভাড়াটেদের ভীতচকিত করে, দোতলায় উঠে এক শীর্ণ মধ্যবয়স্কা মহিলা ও তিনটি কুমারী মেয়েকে ঘুম থেকে তুলে অনেক রকম মস্করা করল। লাথি মেরে দুটো মাটির কলসী ভাঙল, কুমারী মেয়ে তিনটিকে জেরা করার নামে চোখ দিয়ে চাটতে লাগল তাদের গা। অনাবশ্যকভাবে রূঢ় হয়ে তাদের ধাক্কাধাক্কি করল খানিকক্ষণ।

জেল ভেঙে পালিয়ে কেউ যে কলকাতার বাড়িতে এসে লুকিয়ে থাকবে না, একথা পুলিশেও জানে। তবু এসব হলো নিয়মরক্ষা।

এরও পাঁচদিন বাদে একদিন দুপুরবেলা কড়া নড়ে উঠল ও-বাড়ির। সন্টি যদিও নিচেই ছিল, কিন্তু সে দরজা খুলতে পারবে না। একতলার যে ভাড়াটিয়াটি সন্টিকে দিয়ে পিঠে তেল মাখায়, সে মাঝে মাঝে অফিস যায় না। সেই সব দুপুরে সে তেরো বছরের সন্টিকে কোলে বসিয়ে আদর করে। তারপর দুটো একটা টাকা দেয়। সেই দুপুরেও লোকটি সন্টিকে ব্যস্ত রেখেছিল বলে সে দরজা খুলতে এল

না। তিনবার কড়া নাড়ার শব্দ হবার পর দোতলা থেকে নেমে এলো ছন্দা। তার শাড়িটি শতচ্ছিন্ন। বোনেদের মধ্যে একমাত্র সে-ই কিছু টাকা-পয়সা রোজগার করতে পারে না। গরীব ঘরের অশিক্ষিতা কুমারী মেয়ের অর্থ উপার্জনের যে একটি মাত্র পথ, সে পথে সে যেতে চায় না কিছুতে। এক-একজনের মধ্যে একটা ভালো হবার বীজ থাকে। তারা যে পরিবেশেই থাকুক, ভালো আর মন্দ চিনে নেয় চট করে। তারা প্রাণপণে ঝুঁকে থাকে ভালোর দিকে। তারাই বেশি কষ্ট পায়। এ-বাড়ির মধ্যে এই মেয়েটা একদম আলাদা।

দরজা খুলে সে দেখল, একটা অত্যন্ত রোগা, শুকনো চেহারার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীরে চামড়া-মোড়া হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। তার বয়েস সতেরো থেকে সাতচল্লিশ যা হোক হতে পারে, যেন একটি মানুষ 'বনসাই' অথবা বাংলায় একেই বলে বোধহয় 'পুঁয়ে-পাওয়া'! চোখ দুটি অবিকল মৃত মাছের মতন।

ছন্দা জিজ্ঞেস করল, কী চাই?

লোকটি অদ্ভুত কর্কশ গলায় বলল, এটা হ্যারাণদার বাড়ি?

ছন্দা সন্দিগ্ধভাবে বলল, না, এটা হারাণদার বাড়ি নয়। ও নামে কেউ এখানে থাকে না।

—এটা আটচল্লিশ নম্বর?

—হ্যাঁ। তাতে কী হয়েছে!

—একটা চিঠি আছে।

—কার চিঠি? কে আপনাকে পাঠিয়েছে? আমরা কিছু জানি না।

ছন্দা দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল, লোকটা তার আগেই চিঠিটা ঠেসে দিল ছন্দার হাতে। বলল, চিঠিটা এক্ষুণি একবার পড়ে দেখুন। ছন্দা ভয় পেয়ে একটু পেছিয়ে এল। উঠোনে দাঁড়িয়ে কম্পিত হাতে খুলল চিঠিটা।

ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়া হারাণ ক্লাস সিক্সের ছেলের মতন হাতের লেখায় চিঠিটা লিখেছে।

মা, আমি মর-মর। যে করিয়াই হোক আড়াইশো টাকা পাঠাও। এর হাতে। এ খুব বিশ্বাসী। আমি টাকা পরে শোধ দিব। দিব, দিব, দিব। ইতি হারাণ।

এর মধ্যে বিশ্বাসী কথাটা তিন-চারবার কেটে অত্যন্ত বিকট একটা বানানে লেখা।

চিঠিটা পড়ে ছন্দার চোখে জল এসে গেল। এটা ক্রোধের অশ্রু। সে ঠোঁট কামড়ে ধরে কোনরকমে বলল, আপনি চলে যান।

লোকটি সেরকম ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায় আবার জিজ্ঞেস করল, মালটা? যেটা নিয়ে যাবার কথা ছিল?

—হবে না। কিচ্ছু হবে না! চলে যান!

ছন্দা দরজা বন্ধ করে দিল লোকটার মুখের ওপর। তারপর সে ভাবল, চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু ছিঁড়ল না। সেটা হাতে নিয়ে উঠে এল ওপরে।

ছন্দার মা দুপুরে ঘুমোন না। দেয়ালে পিঠ দিয়ে শূন্যে চোখ মেলে বসে থাকেন।

ছন্দা ওপরে এসে বলল, মা, তোমার ছেলে চিঠি লিখেছে। বাড়িতে যদি আবার পুলিশ আসে?

মা ভয় পেলেন না বা উত্তেজিত হলেন না। নির্লিপ্ত গলায় বললেন, কী লিখেছে?

ছন্দা ফিসফিস করে চিঠিটা পড়ে শোনাল।

মা একটাও কথা বললেন না। হঠাৎ মাটিতে শুয়ে পড়ে কাদতে লাগলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে! এই কান্নাটা কিসের জন্য? তাঁর ছেলে, তার প্রথম সন্তান মৃত্যুশয্যায়, এই খবর পেয়ে? অথবা ঐ আড়াই শো টাকা চেয়েছে বলে?

এবার, শিবশঙ্কর লাহিড়ীর ছেলের সম্পর্কেও কিছু তথ্য জানানো যেতে পারে।

এর নাম রণদেব লাহিড়ী। একে আমি কয়েকবার দেখেছি, সুজিতের মারফত পরিচয়ও হয়েছে।

সুজিতের সঙ্গে আমার কলেজ-জীবনের পর খুব একটা দেখাসাক্ষাৎ হতো না। দার্জিলিং-এর সেই হঠাৎ সাক্ষাতের পর যোগাযোগটা আবার বেড়ে গেল। ওর শ্বশুরবাড়িতে আমি আর দেবরাজ যাই, সেখানে দেখা হয়। মাঝে মাঝে ও আমার বাড়িতেও আসে।

একদিন সুজিতই আমাকে নিয়ে গেল হাজরা রোডের একটা ফ্ল্যাটে। দরজার বাইরে নাম লেখা রণদেব লাহিড়ী। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে সে এখানে ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। শিবশঙ্কর লাহিড়ী তাঁর ছেলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখলেও বাড়ির লোকজনেরা গোপনে এখানে আসে। আমি সেদিন বিশাখা আর তার পরের বোন জয়ন্তীকে ওখানে দেখলাম।

রণদেবের স্ত্রীর নাম কৃষ্ণা। তার এই নাম সার্থক। কালো রঙের এমন রূপসী মেয়ে, হাজার জনের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও সবাই ওকে দেখবে। মুখে কোমলতা ও বুদ্ধির ছাপ সমানভাবে মিশে আছে। এই মেয়েটিকে উপলক্ষ করেই পিতা-পুত্রের ঝগড়ার সূত্রপাত। বিয়ের আগে কৃষ্ণার পদবী ছিল দাস এবং সে

সাধারণ একজন স্কুলমাস্টারের মেয়ে। কফি হাউসে আড্ডা দেবার সময় আমাদের মনেই থাকে না যে, এখনো জাতের ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়। কিন্তু এই নিয়ে এখনও রাগ, অভিমান, গৃহবিচ্ছেদ এমনকি হত্যা বা আত্মহত্যাও চলেছে।

কৃষ্ণা ইংরিজিতে এম এ, কাছাকাছি একটি মেয়ে-কলেজে পড়ায়।

রণদেব আমার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট হবে। খড়গপুর আই আই টি থেকে পাশ করা এনজিনিয়ার। বাবার অমতে বিয়ে করে না ফেললে, এতদিনে তার বিলেত বা আমেরিকায় থাকার কথা ছিল। এখন ফিলিপস কোম্পানিতে চাকরি করে।

রণদেব আমাকে দেখে বলল, আমি বিশাখার মুখে আপনার কথা শুনেছি। আপনি তো কাছেই থাকেন, চলে আসবেন মাঝে মাঝে। সন্ধের পর আমরা বাড়িতেই থাকি।

আমি বিশাখার দিকে তাকালাম। ঘরের কোণে একটা ছোট বেতের চেয়ারে বসে আছে বিশাখা। হাতে একখানা বই। যেন ও একাই আলো করে আছে সমস্ত ঘরখানা। রণদেবের কথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসব। এখানে এলে বিশাখার সঙ্গে দেখা হবে। ওদের বাড়িতে গেলেও ওর সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু ওকে একা পাই না। ওর মা গল্প করতে খুব ভালোবাসেন, তিনি সব সময় কাছাকাছি থাকেন আমাদের। এখান থেকে বিশাখা যখন বেরুবে, তখন ওকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব। সঙ্গে ওর ছোট বোন থাকবে, তা থাক না!

রণদেবের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলেই আমি বুঝলাম, শুধু বিয়ের ব্যাপারই নয়, তার বাবার সঙ্গে তার মতভেদ আরো অনেক গভীর কারণে। রণদেব সীরিয়াস ধরনের মানুষ, সাধারণ হালকা কথাবার্তা সে পছন্দ করে না। সে ধনী পরিবারের সন্তান হলেও বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করার দিকে তার ঝোঁক নেই। সে চায় নিজেই কিছু একটা করতে। সে রাজনৈতিক বিশ্বাসে উগ্র ধরনের বামপন্থী। এবং এক হিসেবে সে খুব সৎ। বাবার টাকায় আরামে থেকে সে বামপন্থী বুলি কপচায় না। এমনকি তার অফিস থেকে ট্রেনিং-এর জন্য তাকে আমেরিকায় পাঠাবার কথা হচ্ছে, কিন্তু সে চায় চেকোশ্লোভাকিয়া বা ইস্ট জার্মানিতে যেতে। সম্ভব হলে সে চীনে যেতে চাইত।

আমাকে ও-বাড়িতে বসিয়ে রেখে সুজিত কাছেই আর কার সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘুরে আসতে গিয়েছিল। সুতরাং রণদেবের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে হচ্ছিল আমাকে একা।

আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে হঠাৎ একসময় রণদেব বলল, শিয়ালদার কাছে

রোহিণী বলে যে সিনেমা হলটা আছে, সেটা দেখেছেন? ওটা কার জানেন? আমার বাবার!

আমি কিছু না-জানার ভাব করে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে রইলাম।

রণদেব আবার বলল, ওখানকার কর্মচারীরা আজ প্রায় দুশো পঁচিশ দিন ধরে অনশন ধর্মঘট করে আছে! ভাবতে পারেন, ঐ সাধারণ গরীব লোকরা এতদিন মাইনে না পেয়েও কী করে বেঁচে আছে?

আমি চুপ।

বিশাখা বই মুড়ে রেখে আমাদের দিকে তাকাল। তার মুখে স্পষ্ট দেখা দিল একটা দুঃখের ছায়া। সে তার বাবাকে ভালোবাসে, দাদাকেও ভালোবাসে। সে চায় না, তার দাদা তার বাবার বিরুদ্ধে কিছু বলুক!

রণদেব বলল, ক্রিমিনাল! স্ট্রাইকটা কেন হচ্ছে জানেন, স্রেফ আমার বাবার জেদের জন্য। একজন ক্যাপিট্যালিস্টের জেদ! তাতেই কিছু লোক না খেয়ে মরতে পারে! এদেশে কোন ব্যবস্থা নেই সেটা আটকাবার!

বিশাখা করুণ গলায় শুধু বলল, দাদা!

কৃষ্ণা আর জয়তী এই সময় চায়ের কাপ ভর্তি ট্রে নিয়ে এসে ঢুকল। কৃষ্ণা বলল, তুমি আবার ঐসব কথা শুরু করেছো! ভদ্রলোক আজ প্রথম এসেছেন।

রণদেব বলল, কেন, এতে দোষের কী আছে? এটা আমাদের দেশের একটা প্রবলেম। এ নিয়ে আলোচনা করা যায় না? আমার বাবা হোক আর যেই হোক।

রণদেব এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যে, আমার একটা কিছু উত্তর দিতেই হয়। আমি বললাম, ধর্মঘট জিনিসটা কার্ল মার্কসের অবদান। আর অনশনটা গান্ধীজীর। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তার কোনটাই কাজে লাগছে না। একটা সিনেমা হল বা কারখানা যাই হোক, কোন মালিক যদি জেদ করে সেটা বন্ধ করে রাখে, শ্রমিকরা সেখানে কী করবে? মালিককে না খেয়ে থাকতে হবে না। কিন্তু শ্রমিকরা কতদিন না খেয়ে থাকবে?

—সিনেমা হলটা মালিকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে শ্রমিকদের হাতে দিয়ে দিতে হবে!

—কিন্তু প্রাইভেট প্রপার্টি বিষয়ে আমাদের দেশে যে আইন আছে! পুলিশ এসে মালিক পক্ষের পাশে দাঁড়াবে।

—সেইখানেই তো গোড়ায় গলদ! এই বুর্জোয়া সিস্টেমে...

কৃষ্ণা বলল, ঠিক আছে, চা খাও। এবার অন্য কথা বলো!

রণদেব বলল, অন্য কথা! জানো, আজ দুপুরে আমি রোহিণীর সামনে গিয়েছিলাম। ট্রামে যেতে-যেতে কী খেয়াল হলো, নেমে পড়লাম অমনি!

এবার আমি একটু নড়েচড়ে সিধে হয়ে বসলাম। মালিকের বিদ্রোহী পুত্র গেছে ধর্মঘটীদের সামনে। এর মধ্যে বেশ খানিকটা নাটকীয়তা আছে।

কৃষ্ণা সামান্য ভুরু কুঁচকে বলল, কেন গিয়েছিলে?

রণদেব তীব্র স্বরে বলল, ওদের এই কথাটা বলবার জন্য, আপনারা এই হলটায় আগুন লাগিয়ে দিতে পারছেন না?

বিশাখা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, জয়তী, চল। বৌদি, আমরা যাচ্ছি!

কৃষ্ণা বলল, দাঁড়াও, সুজিত আসুক। ও তোমাদের নিয়ে যাবে। তোমার দাদা মাঝে মাঝে বড্ড বাজে কথা বলে।

রণদেব তার বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, বাবাকে বলিস, আমি আজ রোহিণীতে গিয়েছিলাম!

আমার মনে হলো বিশাখাকে একটু সমর্থন করা উচিত। অর্থাৎ মালিক পক্ষের সমর্থনে কিছু বলি। তাই বললাম, হলটায় আগুন লাগালে কী লাভ হবে? ওটা নিশ্চয়ই ইনসিওর করা আছে। কোনই ক্ষতি হবে না। বরং কর্মচারীদের নামে ক্রিমিনাল কেস আনা যাবে।

—তা হোক। ওটাই একটা প্রতিবাদ!

—এরকম প্রতিবাদে লাভ কী? এর বদলে তারা তো কিছুই পাবে না, বরং আরো ক্ষতি হবে! সম্পত্তিতে আগুন লাগালে মালিক কখনো শ্রমিকের দাবি মেনে নেয়?

—এতে মালিক ভয় পেয়ে যাবে। এই ঘটনা চারদিকে ছড়াবে, তাতে আন্দোলন আরো দানা বাঁধবে। শিবশঙ্কর লাহিড়ীর মতন লোকদের বোঝাতে হবে যে শ্রমিকরা তাদের দয়ার দান চায় না। তারা চায় তাদের ন্যায্য অধিকার। পৃথিবীতে শ্রমিকের টাকা ছাড়া আর কোন টাকাই নেই!

এই সব কথা আমি আগে অনেকবার শুনেছি এবং পড়েছি। তবু এক-একজন লোক এমনভাবে উত্তেজিত হয়ে এইসব কথা উচ্চারণ করে যেন এগুলো তাদেরই নিজস্ব বক্তব্য। শুনতে অবশ্য মন্দ লাগে না!

আমি আবার বললাম, আচ্ছা, মালিক যদি কিছুতেই দাবি মেনে না নেয়, তা হলে এই গরীব কর্মচারীরা কতদিন আন্দোলন চালাতে পারবে?

—এক বছর! দু' বছর! যতদিন না মালিক মাথা নিচু করে?

—কিন্তু ততদিন চালানো কি এদের পক্ষে সম্ভব?

—নিশ্চয়ই! আমি আমার বাবাকে তো চিনি, ঐ কর্মচারীদের মধ্যে দু' একজন যদি গিয়ে ওঁর পায়ের ওপর কেঁদে পড়ে, অমনি উনি ওদের সব দাবি মিটিয়ে দেবেন। কিন্তু ওরা যদি একবার হারে, তবে চিরকালই হারবে! তার বদলে ওদের

মধ্যে একজন দু'জন যদি অনশন করতে গিয়ে মরে যায়, সেটাও অনেক ভালো। এখন তো গভর্নমেন্টের টনক নড়ছে না, কিন্তু অনশনকারীদের একজন অন্তত যদি মরে যায়, অমনি হৈ-চৈ পড়ে যাবে। গদি বাঁচাবার জন্যই তখন কিছু ব্যবস্থা করতে হবে এই সরকারকে। যে মরবে, সে অন্যদের জিতিয়ে দিয়ে যাবে।

আমি চুপ করে রইলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, কে মরবে? আমার রমেশ জ্যাঠাই বয়সে সবচেয়ে বড়, তাঁরই হঠাৎ মরার সম্ভাবনা বেশি। রমেশ জ্যাঠা যদি মরে যায়, তাহলে জ্যাঠাইমা আর তাঁর তিন মেয়ে...। রণদেব কি এসব বুঝবে? মৃত্যুর কথা মুখে উচ্চারণ করা সহজ। কিন্তু যে মরে, সে-ই শুধু জানে, মৃত্যু মানে কত ভয়ংকর শেষ! আর টের পায় তার ওপর নির্ভরশীল পরিবারের লোকেরা।

বিশাখা অধৈর্য হয়ে উঠেছে! সে আর থাকতে চাইছে না! সুজিত না এলেও সে চলে যেতে চায়। আমি বললাম, চলো, আমি তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।

কৃষ্ণা তার স্বামীকে ভর্ৎসনা করে বলল, তোমার বাবার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে বলেই যে তুমি অমনি একজন ট্রেড ইউনিয়নিস্ট হয়ে গেলে, এটা কিন্তু হাস্যকর!

—মোটেই না!

এমন সময় সুজিত এসে গেল। ঘরে ঢুকেই বলল, কী ব্যাপার, এত চ্যাচামেচি কিসের?

কৃষ্ণা বলল, আপনার দাদা আজ এক মস্ত কীর্তি করে এসেছেন।

—কী?

—রোহিণী হলে গিয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে আন্দোলন করতে গিয়েছিলেন।

—তাই নাকি? তারপর কী হলো?

রণদেব বলল, ওদের কয়েকজন আমাকে চিনতে পেরেছিল। ভাবল আমি বাবার হয়ে দালালি করতে এসেছি। আওয়াজ দিল!

হো হো করে হেসে উঠল সুজিত।

রণদেব বলল, তাতে কিছু আসে যায় না। আস্তে আস্তে ওদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে।

সুজিত বলল, বাবা যে কেন হলটাকে শুধু-শুধু এতদিন ফেলে রেখেছেন! অত ভালো পোজিশন। আমি হলে ঐ সবক'টা লোককে ছাঁটাই করে নতুন স্টাফ দিয়ে হলটা চালাতাম। তেরো জন কর্মচারীর আবার ইউনিয়ন হয় নাকি! দরকার হলে পুলিশ প্রোটেকশান নিতাম।

আমি যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি। বিশাখাও বলল, সুজিতদা, আমি এবার বাড়ি যাব। আপনি উঠবেন?

সুজিত বলল, আরে, একটু বসো না! আমাকেও বলল, উঠলি কেন নীলু? বোস না! দাদার সঙ্গে এরকম তর্ক আমার প্রায়ই হয়। হেলদি ডিসকাশন!

সুজিত আর রণদেব আরো তর্ক করল মিনিট দশেক। আমি নির্বাক রইলাম। মনের মধ্যে একটা জিনিস খচখচ করছিল। যে ব্যাপার নিয়ে ওরা আলোচনা করছে, তার মধ্যে আমার একজন আত্মীয়ও যে জড়িত, সে কথা ওদের বলিনি। পরে জানতে পারলে ওরা আমায় অন্য কিছু ভাববে? অনশনকারীদের সঙ্গে আমিও যে একদিন ফুটপাথে বসেছিলাম, সে কথাও ওরা জানে না। পরে শুনলে ভাববে কি, আমি একজন গুপ্তচর?

তবু কিছু বললাম না। রমেশ জ্যাঠা আমার পিসিমার সৎছেলে, সুতরাং ভারী তো আত্মীয়তা! এ আর বলার মতন কিছু নয়।

একটু বাদে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। সুজিত বিশাখা আর জয়তীকে পৌঁছে দেবে, ট্যাকসি ডাকল। আমি মনে মনে সুজিতের মুণ্ডুপাত করলাম। ও আর একটু দেরি করে আসতে পারত না? তাহলে আমিই বিশাখাদের পৌঁছে দিতাম। এখনো একদিন বিশাখার সঙ্গে ভালো করে কথাই হলো না!

ওরা ট্যাকসিতে উঠল, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। বিশাখা যখন গাড়িতে উঠছিল, আমি দেখলাম ওর লাল রঙের চটি, পরিষ্কার তকতকে গোড়ালি, আর শায়ার চিকন লেস। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিশাখা উজ্জ্বলভাবে হাসলো ঠিক যেন সোনালি রঙের সেই হাসিটা। বেরিয়ে আছে একটা হাত, তার পাঁচটা আঙুল যেন মাখনে তৈরি।

ট্যাকসিটা চলে যাবার পরও আমি একটুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো, বিশাখার সেই সোনালি রঙের হাসি, মাখনের তৈরি পাঁচটা আঙুল, তার লাল চটি, পরিষ্কার গোড়ালি, শায়ার লেস—সব মিলিয়ে যে রূপ, তা যেন তখনো সেখানে রয়ে গেছে। পৃথিবীতে দুঃখ, দারিদ্র্য, অবিচার সবই আছে, তবু এই সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারি না। এটা কি অন্যায়? এতেই কি আমার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র প্রকট হয়ে ওঠে?

৬

দুই দাদা বেরিয়ে গেছে অফিসে, বিল্টু কলেজে, বড় বৌদি বাপের বাড়ি, মেজবৌদি তার দিদির মেয়েকে দেখতে গেছে নার্সিং হোমে, বাড়িতে শুধু মা আর আমি। বেলা এগারোটা। মা রান্নাঘরে, আমি নিজের ঘরে বসে দু' একখানা চিঠিপত্র লিখছিলাম, এই সময় ছন্দা এল আমাদের বাড়িতে। সোজা উঠে এল তিনতলায়। সিঁড়ির কাছটায় দাঁড়িয়ে ডাকল, ছোড়দা, ছোড়দা!

আমার আগেই মা বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। একটি যুবতী মেয়েকে দেখেই তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কে?

মা চিনতে না পারলেও ছন্দা মাকে ঠিক চিনেছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে নিচু হয়ে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তারপর বলল, কাকীমা, ভালো আছেন? আমি ছন্দা। বেলেঘাটা থেকে আসছি।

ছন্দা নামটাও মায়ের জানবার কথা নয়, কিন্তু বেলেঘাটার উল্লেখেই তিনি বুঝে গেলেন। তাঁর মুখখানা অপ্রসন্ন হয়ে গেল। শুকনোভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী খবর? তোমার মা ভালো আছেন?

এই সব কথার উত্তরে কেউ কোনদিন অন্য কিছু বলে না। যদিও ভালো থাকার কোন প্রশ্নই নেই, তবু ছন্দা ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

আর কোন কথা না বলে মা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলেন। অর্থাৎ হঠাৎ এলে কেন?

ছন্দা বলল, ছোড়দার সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে।

আমি উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। ওকে বললাম, এসো ছন্দা, ঘরের মধ্যে এসো।

আমার ঘরে একটিই মাত্র চেয়ার। সেটাতে ওকে বসতে বলে আমি বসলাম খাটে। মা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। এই যুবতী মেয়েটি আমার কাছে কোন্ প্রয়োজনে এসেছে, সেটা তিনি জানতে চান। ছন্দা বসল খুব আড়ষ্টভাবে।

আমি বললাম, মা, একটু চায়ের জল বসাও না? দু' কাপ।

ছন্দা বলল, আমি চা খাব না, চা খাই না!

মা বললেন, রোদ্দুরের মধ্যে এসেছে, চা না খাওয়াই ভালো। বরং একটু মিষ্টি নিয়ে আয়। বাড়িতে তো কিছু নেই, তুই নিয়ে আয়, নীলু।

মায়ের সঙ্গে আমার একটা খেলা শুরু হলো। মা চান আমাকে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে সেই সময়টুকুতে মেয়েটিকে জেরা করে জেনে নেবেন, সে কেন এসেছে। কিন্তু আমিই বা হারব কেন?

এবার আমি বললাম, দোকানের মিষ্টি খাইয়ে কী হবে! মেজবৌদি কাল বিল্টুর জন্মদিনের পায়েস রেঁধেছিল, তাই একটু দাও বরং!

ছন্দা করুণ মুখে বলল, না, আমি খাব না।

মা আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। পায়েস নেই একথাও বলতে পারবেন না। কারণ, সকালেই আমাকে এক বাটি দেওয়া হয়েছিল, আমি বলেছিলাম, এখন রেখে দাও, দুপুরে খাব!

ফলে, বাধ্য হয়েই মাকে পায়েস আনতে যেতে হলো। কোন যুবতী মেয়ের সঙ্গে মা আমাকে কিছুতেই নিরালায় থাকতে দিতে চান না। যদি আমার চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়! মায়ের চোখে অবশ্য আমি অতি নিষ্পাপ, ভালোমানুষ, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানি না—কিন্তু কোন মেয়ে যদি আমাকে প্রলোভন দেখায় কিংবা মায়াজাল বিস্তার করে, তা হলে আমার মাথা ঘুরে যেতে পারে! সেইজন্যই মা পায়েস নিয়ে ফিরে এলেন দু' মিনিটের মধ্যে।

সেই ফাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী খবর, ছন্দা?

ছন্দা কোন কথা বলতে পারল না। চেয়ারের হাতলের ওপর আঙুল দিয়ে অদৃশ্য ছবি আঁকতে লাগল আপন মনে।

—কী খবর? আমায় কী যেন বলবে বলছিলে?

ছন্দা তবু চুপ।

—তোমার বাবার স্ট্রাইক মিটেছে?

এবার সে মৃদু গলায় বলল, না।

—তুমি আমাদের বাড়ি চিনলে কী করে?

—খুব ছোটবেলায় একবার এসেছিলাম।

এই সময় মা পায়েসের বাটি আর জলের গেলাস নিয়ে এলেন। এসে দেখলেন, আমরা চুপ করে বসে আছি। বেশ সন্দেহজনক স্তব্ধতা।

ছন্দা লজ্জায় পায়েস খেতে চাইছে না। তাকে জোর করে খাওয়ানো হলো। এরপর ঠিক আমি যা-যা প্রশ্ন করেছিলাম ওকে, মা-ও সেই প্রশ্নগুলোই করলেন। সেই রকম সংক্ষিপ্ত উত্তর। মা বুঝতে পেরেছেন, তাঁর সামনে ও আর বিশেষ কিছু বলবে না। ওর কোন গোপন কথা আছে। মা'র চোখ দু'টি আরও খরশান হলো।

এই সময় দোতলায় সিঁড়ির মুখে দরজায় খট খট শব্দ হলো। কে যেন এসেছে। মায়ের মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এবার তার জয়। নিশ্চয়ই আমাকে কেউ ডাকতে এসেছে। এই রকম সময় আমার বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কেউ আসে না। এরপর আর আমি একলা একটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে ঘরের মধ্যে বসে গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর করতে পারব না।

আমি উঠে গেলাম দেখতে। দোতলার সিঁড়ির দরজা খুলে দেখে নিয়েই আবার চট করে ওপরে উঠে এলাম। এবার আমার জয়ের পালা। আমি হাসিমুখে মায়ের দিকে তাকালাম।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কে?

আমি বললাম, ধোপা!

মায়ের মুখখানা আবার নিভে গেল। ধোপাকে জামা-কাপড় দেওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণই মায়ের ডিপার্টমেন্ট। এবং ঐ ব্যাপারে অনেকক্ষণ সময় লাগে। একটাও জামা-কাপড় ফেঁসে গেছে কিনা বা বদলাবদলি হয়ে গেছে কিনা, তা মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে হবে তো।

মাকে এবার যেতেই হবে। প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি বললেন, তুই যে পা-জামাটা পরে আছিস, ওটা ছেড়ে দে! ওটা এবার কাচতে দিতে হবে।

ঘরে একটি মেয়ে বসে আছে। এর মধ্যে আমি পা-জামা ছাড়ি কি করে? এই প্রসঙ্গটা এখন না তুললে হতো না? পরের সপ্তাহে দিলেও তো চলত। যাই হোক, বাথরুমে গিয়ে অন্য একটা পা-জামা পরতে হলো। ফিরে এসে দেখি ছন্দা দু' হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদছে।

আমি একটু চমকে গিয়ে বললাম, কী হলো, ছন্দা?

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে ও বলল, কিচ্ছু না।

আমি এগিয়ে গিয়ে একটা হাত ওর কাধে রেখে অন্য হাতে ওর থুতনিটা উঁচু করে তুলে ধরে বললাম, কী হয়েছে?

ওর শরীরটা কাঁপছে। আমি ওর গালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, কী হয়েছে, বলো তো?

এই অবস্থায় মা আমাকে দেখে ফেললে ভাবতেন, আমি সুযোগ পেয়েই অসভ্যতা শুরু করে দিয়েছি। একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য তার গালে হাত দেবার দরকার কী? কিন্তু আমি স্পর্শে বিশ্বাস করি। অনেক কথা যা মুখে বলে বোঝানো যায় না, তা আঙুলের ডগায় স্বচ্ছভাবে প্রবাহিত হয়ে যায়। মানসিক সংযোগ অনেক দ্রুত হয়। আমি ছন্দাকে ছুঁয়ে বুঝিয়ে দিলাম, দেখো, আমি সুযোগ-সন্ধানী নই। দেখো, আমি তোমার প্রতি অমনোযোগী নই। দেখো, আমি তোমার দুঃখে অংশ নিতে চাই!

ছন্দা চোখ মুছে ফেলতেই আমি খাটে গিয়ে বসলাম।

ছন্দা বলল, আমি শুধু-শুধু আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি, আমি আসতে চাইনি, কিন্তু আমি কোথায় যাব? আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমি কী করে মরব বলুন তো?

আমি একটু অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, যাঃ, এসব কথা কী? মরার কথা উঠছে কেন?

—আমার বাবা আমাদের রোজ মরে যেতে বলেন। কিন্তু এমনি এমনি কি কেউ মরে যেতে পারে?

—ওটা তো রাগের কথা।

—আমি আর ও-বাড়িতে একটুও থাকতে চাই না। আর বেশিদিন থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব! সবাই আমাকে এমন জ্বালাতন করে।

—কেন, নতুন কিছু হয়েছে?

—আমাদের বাড়িতে রোজ পুলিশ আসে।

—পুলিশ? সে কি?

—হ্যাঁ, রোজ রাত্তিরে পুলিশ আসে। আর দিনের বেলা একজন করে লোক আসে, আমার দাদার নাম করে টাকা চায়। টাকা না পেলে তারা দাদাকে ধরিয়ে দেবে বলেছে।

এই সময়ই আমি ছন্দার কাছ থেকে তার দাদা সম্পর্কে কিছু কিছু খবর পেলাম। ব্যাপারটা বীভৎস রকমের অদ্ভুত! পুলিশ নাকি এর মধ্যে রমেশ জ্যাঠাকে একদিন মেরেছে। মেয়েদের প্রায়ই ধরে নিয়ে যায় থানায়। একজন বুড়ো লোক, যে প্রায় খেতেই পায় না, তাকেও পুলিশ মারতে পারে? পুলিশদের কি বাবা নেই?

অবশ্য এক্ষেত্রে পুলিশদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। রমেশ জ্যাঠার অনশন-ধর্মঘটের ব্যাপারে পুলিশের কোন মাথাব্যথা নেই। অনশন বা ধর্মঘট তো গণতান্ত্রিক আন্দোলন, তাতে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে কেন? কিন্তু জেল থেকে পালানো একটা সাঙ্ঘাতিক অপরাধ। পুলিশের ধারণা, হারাণ কোথায় লুকিয়ে আছে, তা তার বাবা-মা এবং বোনেরা জানে। সুতরাং ওদের ওপর খানিকটা চাপ দিলেই খবরটা বেরিয়ে আসবে। দু'চারটে চড়-চাপড়, মেয়েদের একটু অপমানের ভয় দেখানো, এই আর কি! হারাণের মতন একজন চুনোপুটি অপরাধীকে ধরবার জন্যই বা পুলিশের এত তোড়জোড় কেন? পরে জেনেছি, পুলিশের শুধু ধারণা নয়, দৃঢ় বিশ্বাস যে, হারাণকে ধরতে পারলেই পলাতক নকশালদের ঘাঁটির সন্ধান পাওয়া যাবে। সেইটাই সবচেয়ে জরুরি।

ছন্দাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আমি বললাম, ঠিক আছে, আমার এক বন্ধুর দাদা পুলিশের একজন বড় অফিসার, আমি তাঁকে গিয়ে বলব, যাতে তোমাদের ওপর আর—

ছন্দা সে কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলল, আমি ও-বাড়িতে আর যাব না! আমাকে অন্য কোথাও একটু থাকার ব্যবস্থা করে দিন!

—অন্য কোথায় তুমি থাকবে?

—তা আমি জানি না! যে-কোন জায়গায়!

এই মেয়েটিকে আমি কোথায় থাকতে দেব? আমার কতটুকু সাধ্য। সবচেয়ে সহজ অবশ্য আমাদের বাড়িতেই থাকতে দেওয়া! একটি মেয়ে আমাদের বাড়িতে থাকলে এমন কী অসুবিধে হবে? খরচও তেমন কিছু বাড়বে না! কিন্তু আমি জানি, মা কিছুতেই রাজি হবেন না। হুট করে একটি কুমারী মেয়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে চাইলে মা-মাসী-পিসীরা সেটা সুনজরে দেখেন না। আমার পক্ষে জোর করারও উপায় নেই। আমি বাড়ির মালিক নই, আমি এ বাড়ির বেকার ছেলে!

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ছন্দা বলল, আপনাকে বলেছিলাম, আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে—

—চেষ্টা করছি! কয়েক জায়গায় বলে রেখেছি। একটু সময় লাগবে!

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ছন্দা বলল, আমি যাই!

আমি বললাম, আর একটু বসো!

—আমি জানি, আপনাকে আমি বিরক্ত করছি। কিন্তু আমি কাকে গিয়ে এ-সব কথা বলব? আমার যে আর কেউ নেই। আচ্ছা আমি যাচ্ছি, দেখি কী হয়। বোধহয় আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না!

আমি আবার উঠে এসে ছন্দার কাঁধে হাত রেখে বললাম, লক্ষ্মীটি, হঠাৎ পাগলের মতন কিছু করে বসো না। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই!

এর পরক্ষণেই মা এসে ঘরে ঢুকলেন। আমি অপরাধীর মতন তাড়াতাড়ি আমার হাতটা সরিয়ে নিলাম। ছন্দা পাগলাটে গলায় বলল, কাকীমা, আমি যাই!

মা ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বললেন, কথা হয়ে গেছে?

উত্তর না দিয়ে ছন্দা ঝুঁকে আবার মাকে প্রণাম করল। আমি দেখলাম, এই ক'দিনে সে আরো রোগা হয়ে গেছে, তাকে দেখাচ্ছে একটা শীর্ণ শালিকের মতন। কণ্ঠার হাড় প্রকট, হাতগুলো সরু সরু, ব্লাউজটা ঢলঢলে, তার শাড়িটা তিন-চার জায়গায় শেলাই করা। মাত্র উনিশ কিংবা কুড়ি বছর বয়েস মেয়েটার। রমেশ মুখার্জির মেয়ে না হয়ে ও অন্য কারুর মেয়ে হলে হয়তো এখন কলেজে পড়ত, ওর স্বাস্থ্যে দেখা দিত জৌলুস, আধুনিকতম ডিজাইনের শাড়ি পরে ও অনায়াসে কফি হাউসের আড্ডায় বসে নানারকম ঝকঝকে আলোচনায় যোগ দিতে পারত।

মা বিরক্ত হবেন জেনেও আমি ছন্দাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ল। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি ওকে জিজ্ঞেস

করলাম, আচ্ছা, তোমার ঠিক ওপরের বোন, যাকে আমি সেদিন দেখিনি, সে কি কোথাও চাকরি-টাকরি করে?

আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে ছন্দা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, বেশ্যা! সে বেশ্যা হয়ে গেছে। সেইজন্যই তো বাবা চান আমরা সবাই মরে যাই!

কথাটা সে এমন তীব্র ঝোঁক দিয়ে বলল যে, আমি থমকে গেলাম। সে তার মলিন শাড়ি ও শীর্ণ শরীর নিয়ে হঠাৎ অত্যন্ত অহংকারী হয়ে চলে গেল গটগটিয়ে।

আমার জিভের তলায় একটা নিমপাতার স্বাদ। ফিরে এলাম আস্তে আস্তে। বাড়ি ফেরা মাত্রই মা জিজ্ঞেস করলেন, ক' টাকা দিলি?

তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ল, সত্যিই তো, ছন্দাকে কয়েকটা টাকা দেওয়া উচিত ছিল আমার। নিশ্চয়ই ওরা একটা মরিয়া অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। হয়তো কয়েকদিন ধরে ওদের একদমই খাওয়া জুটছে না। সেই জন্যই মুখটা অত শুকনো দেখাচ্ছিল। ছিঃ, ছিঃ, কেন আমি ওকে টাকার কথাটা জিজ্ঞেস করলাম না!

মা বললেন, একবার দিয়েছিস তো, এখন বারবার আসবে! সেই জন্যই তখন বারণ করেছিলাম। কত টাকা দিলি, বল না আমাকে! লুকোচ্ছিস কেন?

আমি ঝাঁজের সঙ্গে উত্তর দিলাম, আমি কোথা থেকে টাকা দেব, আমার কাছে কি টাকা থাকে? তাছাড়া, আমার কাছে টাকা চায়ওনি।

—তাহলে তোর কাছে এসেছিল কেন?

—চাকরির খোঁজ করতে।

—চাকরি? ও আবার কী চাকরি করবে? লেখাপড়া শিখেছে কিছু?

—না, বিশেষ শেখেনি।

—তাহলে? ওকে কে চাকরি দেবে?

—ঠিকই! ওকে কেউ চাকরি দেবে না। সুতরাং হয় ও না খেয়ে মরবে অথবা আত্মহত্যা করবে। তাই না?

—শেলাই-ফোঁড়াই-এর কাজ কিছু করলেই পারে? আজকাল কত মেয়েই তো ওসব জোগাড় করে নেয়। তুই তার কী করবি? তোর কাছে আসে কেন?

আমি মায়ের মুখের দিকে স্পষ্ট ক'রে তাকালাম। তারপর আস্তে আস্তে বললাম, মা, শোনো। ঐ ছন্দা যে শাড়িটা পরে এসেছিল, সেটা দেখেছিলে? তিন-চার জায়গায় ছেঁড়া। ওর বয়সী কোন ভদ্র-পরিবারের মেয়ে ঐ রকম শাড়ি পরে কখনো রাস্তায় বেরোয় না। তোমার একবারও মনে হলো না, ঐ মেয়েটিকে একটা শাড়ি দেওয়া উচিত?

—পৃথিবীতে কি গরীব-দুঃখীর অভাব আছে? ক'জনকে আমরা শাড়ি দিতে পারব? এই তো সেদিন আমাদের ঠিকে ঝি-র মেয়েকে একটা শাড়ি দিলাম।

—বৌদিদের আমি দেখেছি, এর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক আস্ত শাড়ি বদলে বাসনপত্র রাখে। একটা স্টিলের বাটি বা গেলাশ না রেখে সেই রকম একটা শাড়ি এই মেয়েটিকে দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?

—তুই চুপ কর তো, বেশি বড়-বড় কথা বলিস না। ওর বাবা নিজের ছেলেমেয়েদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে পারে না? সারাটা জীবন গায়ে ফুঁ দিয়েই কাটাল। অকর্মার গোঁসাই একটা!

—মা, দুশো পঁচিশ দিন ধরে অনশন ধর্মঘট করাটাকে ঠিক গায়ে ফুঁ দিয়ে কাটানো বলে না। হয়তো প্রথম জীবনে কিছু ভুল করেছেন—

—মোট কথা, ওরা এ বাড়িতে বেশি আসা-আসি করুক, এটা আমি পছন্দ করি না। পাঁচজনে পাঁচকথা বলবে। তুই তো ছেলেমানুষ, কিছু বুঝিস না : দেখবি, যাদের উপকার করতে যাবি, তারাই উল্টে তোর নামে বদনাম দেবে। যুগটাই এ-রকম। কোন মেয়ের জন্য তুই কিছু করতে গেলে দেখবি লোকে বলবে, নিশ্চয়ই তোর কোন বদ মতলব আছে।

—ঠিক আছে, সে আমি বুঝব!

—আমার কথা না শুনতে চাস, শুনিস না। কিন্তু আমি এখনো বলে রাখছি, অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

মা বেরিয়ে গেলেন আমার ঘর থেকে। আমি দরজা ভেজিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে। আর কিছুর জন্য নয়, নিজের অসহায়তার কথা ভেবে। আমি কী সাহায্য করতে পারি? কিছুই না। মেয়েটিকে মিথ্যে স্তোকবাক্য দিলাম।

একদিকে রণদেব, আর একদিকে আমার মা। রণদেব চায় নিজের পৈতৃক সম্পত্তিতে আগুন ধরিয়ে দিতে। আর আমার মা নিজের সংসার আর ছেলেমেয়েদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখতে চান না। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর কোনটাতেই কিছু উপকার হয় না এই সমাজের। আর আমিই বা কী করছি? শুধু লোকের সমালোচনা করতে পারি—সকলেই এই সমালোচনার কাজ ভালো পারে, কারণ এতে কোন পরিশ্রম নেই।

মা আবার ঘরে ঢুকলেন। হাতে তিনখানা পুরোনো শাড়ি। এগুলো তাঁর যৌবনকালের। মায়ের মুখ-চোখ আর কণ্ঠস্বর হঠাৎ বদলে গেছে।

নরম গলায় মা বললেন, নীলু, এই তিনখানা শাড়ি আর আমার তরফ থেকে পঁচিশটা টাকা তুই ওদের বাড়িতে দিয়ে আয়। সরমা বৌদির কথা ভেবে আমার কষ্ট হচ্ছে। সারা জীবন শুধু কষ্ট পেয়ে গেলেন। এখন এত বিপদের মধ্যে...

এবার আমার সত্যিকারের রাগ হলো। আমি দপ্ করে জ্বলে উঠে চেঁচিয়ে

বললাম, একটু আগে এ-কথা মনে পড়েনি? মেয়েটি যখন ছিল, তখন দিতে পারোনি তার হাতে! এখন এগুলো আমাকে বয়ে নিতে যেতে হবে? আমি কি এ-বাড়ির চাকর? সব কাজ করতে হবে আমাকে? না, আমি পারব না!

রাগ করে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। কোথায় যাব? হঠাৎ মনে হলো, নিউ আলিপুরে ছোট মাসীর বাড়িতে যাই। দুপুরটা ওখানেই কাটিয়ে দেব।

বাস থেকে নেমে আবার আর একটা কথা মনে পড়ল। মা একটা উপকার করেছেন। মা যে বললেন, ছন্দা শেলাই-ফোঁড়াই-এর কাজ জোগাড় করতে পারে, সেটা থেকে একটা সূত্র পাওয়া গেছে। ছন্দা কোন চাকরি পেতে পারে, সেটা আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না। কিন্তু শেলাইয়ের কাজ...। ছোট মাসীরই এক বান্ধবী কোন এক মহিলা আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত শুনেছিলাম! গরীব মেয়েরা সেখানে নানা রকম শেলাইয়ের কাজ করে কিছু উপার্জন করে।

তক্ষুনি ছোট মাসীর কাছে গিয়ে বললাম, তোমার বান্ধবী সেই যে মিসেস চৌধুরী, তার সঙ্গে আমি একটু আলাপ করতে চাই। কেন, কী বৃত্তান্ত সে-কথা ছোট মাসীকে বুঝিয়ে বলতে অনেক সময় লাগবে। বললাম, ওদের আশ্রমটা একটু ঘুরে দেখব, ওঁর একটা ইন্টারভিউ নেব। একটা পত্রিকা থেকে আমাকে এ সম্পর্কে লিখতে বলেছে।

ছোট মাসী জিজ্ঞেস করলেন, লিখলে তুই টাকা পাবি?

—বাঃ, পাব না কেন? বিনা টাকায় কেন লিখতে যাব?

—তাহলে যা টাকা পাবি, তার অর্ধেক দিতে হবে ঐ মহিলা আশ্রমকে। ওদের ঐ নিয়ম।

—ঠিক আছে। পাব টাকা গোটা তিরিশেক, তার অর্ধেক পনেরো টাকা দিয়ে দেব স্বচ্ছন্দে। আমার ট্যাক্সি ভাড়াটা তুমি দিয়ে দিয়ো!

ছোট মাসীকে দিয়ে ফোন করিয়ে জেনে নিলাম, মিসেস চৌধুরী তখন বাড়িতে আছেন। ওঁর বাড়ি যোধপুর পার্কে। ছোট মাসী বললেন দুপুরবেলা খেয়ে যেতে। এ বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালোই হয়। কিন্তু আমি সে লোভ সংবরণ করলাম। আমার শরীরটা কেমন জ্বালা জ্বালা করছে। বেরিয়ে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে।

রু আফজা সরবৎ খেতে-খেতে মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে কথা হলো অনেকক্ষণ। এঁর স্বামী আর্মির একজন কর্নেল, হাতে প্রচুর সময়, তাই সমাজসেবা করেন। ব্যাপারটা বেশ ভালোই। সরকারের কাছ থেকে অর্থসাহায্য আদায় করেছেন আশ্রমের জন্য। তাছাড়া মাঝে মাঝে চ্যারিটি-শো করে টাকা তোলেন। দুঃস্থা মেয়েরা ঐ আশ্রমে নানা রকম হাতের কাজ শেখে। কেউ কেউ ওখানে থাকে, অনেকে বাড়ি থেকেই আসে। ওদের তৈরি করা জিনিসপত্র কটেজ ইন্ডাস্ট্রির

দোকান থেকে বিক্রি হয়। মেয়েরা মাসে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা স্টাইপেন্ড পায়। কিংবা, যদি ওখানেই থাকে, তাহলে খাওয়া-থাকা বাদ দিয়ে চল্লিশ টাকা হাত-খরচ পাবে।

এবার বলে ফেললাম আমার আসল কথাটা। আমার চেনা একটি মেয়েকে ওখানে কাজ দিতে হবে।

মিসেস চৌধুরী সোফায় মাথা হেলান দিয়ে বললেন, এ বছর হবে না। সামনের বছর সেপ্টেম্বর মাসের দিকে চেষ্টা করবেন—

আমি বললাম, কেন, হবে না কেন?

—কোনো উপায় নেই।

—উপায় একটা বার করতেই হবে।

—অসম্ভব। আমরা মোট পঞ্চাশটি মেয়ে নিই। তার জন্য কত অ্যাপ্লিকেশন আসে জানেন? আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার। তার মধ্যে অনেক বি-এ পাশ, এম-এ পাশ মেয়েও থাকে। এদের মধ্যে থেকে বাছাই করা কত শক্ত বলুন! তাই আমাদের খানিকটা কঠোর হতেই হয়—

—শুনুন, আমি যে মেয়েটির কথা বলছি, সে এমন বিপদে পড়েছে...

আমাকে থামিয়ে দিলেন মিসেস চৌধুরী। খানিকটা দুঃখিত হাসির সঙ্গে বললেন, দেখুন, সবাই ঐ কথাই বলে। ঠিক মিথ্যেও বলে না। কোন বিপদে বা অসহায় অবস্থায় না পড়লে ভদ্রঘরের মেয়েরা সামান্য একশো পঁয়তিরিশ টাকার জন্য এই কাজ করতে আসবেই বা কেন? আমরা সকলের প্রয়োজনটাই সমানভাবে দেখি।

মিসেস চৌধুরীর পুরো নাম প্রতিভা চৌধুরী। আমি এবার গলায় খানিকটা করুণ রস মিশিয়ে বললাম, প্রতিভা দেবী, তবু এই মেয়েটির জন্য একটা কিছু করতেই হবে আপনাকে।

প্রতিভা চৌধুরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হাত দিয়ে শাড়ির পাড় প্লেন করতে করতে বললেন, এ বছরের লিস্ট প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। এখন কারুর কথা শুনে আর একজনকে নেওয়া মানেই আগের একজনকে বাদ দেওয়া। সেটা অন্যায়। সেরকম অন্যায় আমি করব কেন? আপনিই বা সেরকম অন্যায় অনুরোধ জানাবেন কেন আমাকে?

—তার কারণ, এটাকে খুব একটা অন্যায় বলে মনে হচ্ছে না আমার। এই মেয়েটির চেয়ে নিশ্চয়ই আরো অসহায় আরো বিপন্ন মেয়ে অনেক আছে, অনেকের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আরো অনেক বেশি, কিন্তু আমরা চোখের সামনে যাকে কষ্ট পেতে দেখি, তার কষ্টটাই আমাদের বেশি মনে হয়, তার কষ্টটাই আমরা

প্রথমে দূর করতে চাই। রাস্তায় একজন লোককে গাড়ি চাপা পড়ে আহত হতে দেখলে আমরা কি বলব, এই মুহূর্তে কত লোক না খেয়ে মরছে, সুতরাং এ আর এমন কথা কি? সেই আহত লোকটির দিকে না তাকিয়ে চলে যাব?

প্রতিভা চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটি আপনার কে হয়?

আমি দু'এক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম। বলতে পারতাম, আমার এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠতুতো বোন। কিন্তু সেটা কী রকম বোকা-বোকা শোনায়। নিজের বা আত্মীয়স্বজনদের জন্য কখনো কারুর কাছে করুণা ভিক্ষে চাইনি। পরোপকার করা আমার নেশা নয়। নেহাৎ মেয়েটিকে একটা মিথ্যে স্তোকবাক্য দিয়ে ফেলেছি।

বললাম, কেউ হয় না। এমনিই চেনা।

মনে হয়েছিল প্রতিভা চৌধুরী অনেকটা নরম হয়ে এসেছেন। কিন্তু হঠাৎ আবার বললেন, আমি দুঃখিত, এখন আর কিছু করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। সকলের কাছে চিঠি চলে গেছে। আপনি ওকে আগামী বছর পাঠাবেন।

এতখানি চেষ্টা করেও হেরে যেতে কারুর ভালো লাগে না। কিন্তু কর্নেল সাহেবের স্ত্রী একেবারেই অনমনীয়া। আর কোন যুক্তি খুঁজে পেলাম না। হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, আপনি যদি আমার এই অনুরোধটুকু রাখতেন, তাহলে ভবিষ্যতে আমিও কখনো না কখনো আপনার কোন উপকার করতাম।

তিনি তাঁর ভ্রমরকালো দুই চোখে কৌতূহল এবং বেদানা রঙের পাতলা ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার কী উপকার করবেন?

আমি তাঁর ঘরের চারপাশে তাকালাম। ঐশ্বর্যের সঙ্গে রুচি মিশে আছে। সিনেমায় সাহেব-মেমদের ঘরও এই রকমই সাজানো থাকে। সত্যিই তো, আমি এঁর কী উপকার করতে পারি! এই কথাটা বলাই আমার ধৃষ্টতা হয়েছে।

আমি বললাম, তা জানি না, কিন্তু কিছু একটা উপকার করার ইচ্ছে আমার ভেতরে ভেতরে থেকে যেত।

উনি আবার সমাজসেবিকার মতন আদর্শবাদী মুখ করে বললেন, এটা আমার কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। উপকার-টুপকারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমাকে নিয়মকানুন মেনে চলতেই হয়।

আমি বললাম, হ্যাঁ, সে তো ঠিকই। আচ্ছা নমস্কার।

বাইরে বেরিয়ে এসে ফুটপাথের বাসস্টপে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালাম। ছোট মাসীর বান্ধবী হিসেবে এতক্ষণ ধরে শ্রীমতী প্রতিভা চৌধুরীকে সমীহ করে সিগারেট না খেয়ে দম বন্ধ করে থাকার কোন কারণ ছিল না। অবশ্য আমি প্রতিভা চৌধুরীর নামে কোন দোষ দিতেও পারছি না। উনি কঠোর ন্যায়ের পথে থাকতে চান! উনি যদি আমার কাছে ঘুষ চাইতেন, আমি ওঁর আড়ালে গিয়ে প্রচুর গালাগাল

করে গায়ের জ্বালা মেটাতাম। কিন্তু উনি সে সুযোগ দেননি। মানুষের সততাও এক এক সময় দুঃসহ হয়ে ওঠে।

আমি বিড়বিড় করে বললাম, ছন্দা, আমি তোমাকে সত্যিই মিথ্যে কথা বলেছি। আমার সাধ্য কিছুই নেই! তা হলে তুমি মরো। মরা এমন কিছু শক্ত নয়, বেঁচে থাকাটাই শক্ত। লণ্ঠনের কেরোসিনটুকু শাড়িতে ঢেলে তারপর সামান্য একটা দেশলাই কাঠির আগুন। অথবা তুমি বেশ্যা হয়ে যাও না! তোমার অন্য বোনদের মতন শরীরের বিনিময়ে পয়সা আনো। ভালো খাও-দাও, বেঁচে থাকো! যে খেতে পায় না, তার কাছে সতীত্বের দাম কানাকড়ি, কানাকড়ি। মৃত্যুর মতন অশ্লীল জিনিস আর কিছুই হতে পারে না।

হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা আমি একটা কুকুরের গায়ে ছুঁড়ে মারলাম।

৭

শিবশঙ্কর লাহিড়ীর কাছে ন্যাশনাল লাইব্রেরির প্রসঙ্গটা তোলা আমাদের পক্ষে একটা কাঁচা কাজ হয়ে গিয়েছিল। উনি একদিন কথায় কথায় ওঁর এক পিতৃবন্ধুকে বলে ফেললেন যে, বাবার পুস্তক-সংগ্রহ উনি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দান করছেন। পিতৃবন্ধুটি এক থুড়থুড়ে বুড়ো, তবু প্রতিদিন টুকটুক করে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরোনো বইয়ের পোকা বাছেন। তাঁর নবলব্ধ জ্ঞান পৃথিবীর কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু তাঁর মুখে একটা টুসটুসে পাকা ফলের মসৃণতা আছে।

শিবশঙ্করের মুখে খবর পেয়েই তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরির দু'জন কর্মীকে নিয়ে সটান চলে এলেন সে-বাড়িতে। আমরা তখন সেখানে উপস্থিত। আমাদের যদিও চোর বলে ধরবার উপায় নেই, আমরা তো ক্যাটালগ তৈরি করছি। আমরা মনে মনে সেই বুড়োটির মুণ্ডুপাত করতে লাগলাম। ন্যাশনাল লাইব্রেরির কর্মী দু'জন অবশ্য আমাদের লেখা ক্যাটালগ দেখে অবজ্ঞায় ভুরু কুঁচকোলেন। ওসব নাকি অনেক বৈজ্ঞানিক রীতিতে করতে হয়! ফলে আমাদের বেগারের চাকরিটি গেল। ও-বাড়িতে প্রতি সন্ধেবেলা যাওয়ার আর কোন ছুতো রইল না আমাদের।

যাই হোক, ইতিমধ্যে দেবরাজ আর আমি মোটামুটি বেশ দামি দেড়শো খানা বই সরিয়ে ফেলতে পেরেছি। শেষ দিনে বেশ ঝুঁকি নিয়ে আমরা আরো তেরোখানা বই সঙ্গে নিয়ে এলাম।

বাইরে এসে দেবরাজ বলল, তুই একটা অপদার্থ।

আমি ভুরু তুললাম।

দেবরাজ বলল, তোকে বলেছিলাম এ-বাড়ির কোন একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে নিতে। তাহলে সেই মেয়েটিকে দিয়ে বলানো যেত যে, বইগুলো কোন লাইব্রেরিতে দেবার দরকার নেই, বাড়িতেই থাক।

—তুই-ই তো প্রথম লাইব্রেরির কথা বলেছিলি।

—ওরকম একটা প্রথমে আওয়াজ তুলে দিতে হয়। নইলে সে-বাড়ির লোক আমাদের বিশ্বাস করবে কেন? তারপর বাড়ির মধ্যেই এমন-এমন জনমত গড়ে তুলতে হয়, যাতে বইগুলো লাইব্রেরিতে না যায়। একটু সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিলেই কাজ হয়। তোকে যে বলেছিলাম, সেজো মেয়েটার সঙ্গে লড়ে যেতে, যে-মেয়েটা তোর দিকে আধো-আধো চোখে তাকিয়েছিল, তোর লেখার প্রশংসা করেছিল—তুই সেই মেয়েটার সঙ্গে কিছু পারলি না? একশো টাকা বাজি ফেলেছিলি মনে আছে? টাকাটা দিয়ে দিস।

আমি দুর্বলভাবে বললাম, এখনো এক মাস হয়নি।

দেবরাজ ধমক দিয়ে বলল, তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না!

আমি একটা চোরা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। বিশাখার সঙ্গে বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল আমার। সন্ধেবেলা স্নান করে সারা গায়ে পশ্চিমী সভ্যতার সুগন্ধ মেখে ও এক-একদিন এসেছে লাইব্রেরিতে আমার সঙ্গে গল্প করতে। আমাকে বেশ কয়েকবার বলেছে, আমি আপনাকে একটা ঘটনা বললে সেটা আপনি লিখতে পারবেন? সাধারণত এই রকম অনুরোধ কেউ করলে আমি উত্তর দিই, আমি তো ভাই অন্যের মুখে শোনা গল্প লিখতে পারি না। আমি লিখি নিজের জীবনের গল্প।

কিন্তু বিশাখাকে সে কথা বলিনি। আমি বিশাখার ঘটনাটা শুনতে চেয়েছিলাম। কারণ, হয়তো, বিশাখার সঙ্গে আমার নিজের জীবন খানিকটা জড়িয়ে যাবে। এরকম একটা আশা পোষণ করছিলাম গোপনে।

আমি বলেছিলাম, নিশ্চয়ই! একদিন বেশ ভালো করে বসে শুনতে হবে।

ঘটনাটা এখনো শোনা হয়নি। মনে মনে ঠিক করেছিলাম, কোন একদিন গঙ্গার ধারে সন্ধেবেলা অল্প জোৎস্না মেশানো অন্ধকারে বিশাখার কোলে মাথা রেখে আমি তার জীবনের গল্প শুনব।

এসবই আমার অতিরিক্ত কল্পনা। হঠাৎ যে-কোন মুহূর্তে ঘোর ভেঙে যায়।

সেই ঘোর ভেঙেছে মাত্র কয়েকদিন আগে। সন্ধের দিকে কোন কাজ ছিল না, ভেবেছিলাম একবার রণদেবের বাড়িতে গিয়ে একটু আড্ডা দিয়ে আসব। আমি হেঁটেই যাচ্ছিলাম, রণদেবের বাড়ির কাছাকাছি যখন পৌঁচেছি, সেই সময়

আমার সামনে দিয়ে একটা ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল। চমকে তাকিয়ে দেখলাম, ট্যাক্সিতে বসে আছে, বিশাখা আর একটি সুদর্শন যুবক। ওরা কোন অসমীচীন ভঙ্গিতে ছিল না, সামান্য দূরত্ব রেখে দু'জনে পাশাপাশি। দু'জনের দিকে তাকিয়ে। দু'এক পলকের জন্য দেখেও বুঝেছিলাম, সেই দৃষ্টিতে সম্মোহন আছে। পরস্পর যেন চুম্বকের টানে বাঁধা।

ট্যাক্সিটা থামল রণদেবের বাড়ির সামনে। বিশাখা নামল, কিন্তু যুবকটি রয়ে গেল! বিশাখা নেমে যেতেও যুবকটি ঝুঁকে পড়ে তার একটি হাত চেপে ধরল। বিশাখাকে সে যেতে দিতে চায় না। বিশাখা নরমভাবে ছাড়িয়ে নিল নিজের হাত। হেসে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চলে গেল। রণদেবের বাড়ির সিঁড়িতে পা দেবার আগে সে পেছন ফিরে তাকাল তিনবার। ট্যাক্সিটা তখনো থেমে। রাস্তার ওপার থেকে দেখে আমার বুক মুচড়ে উঠেছিল। এর প্রতিটি টুকরো টুকরো দৃশ্যের মর্ম আমি জানি। সাধারণ কোন বন্ধুর দিকে কোন মেয়ে এমনভাবে তাকায় না।

কিন্তু এজন্য আমার দুঃখ পাবার কারণ কী? আমি তো বিশাখার কেউ নয়। আমি তো সামান্য একজন লেখক। একজন লেখকের কাছে কোন কোন মেয়ে মনের কথা বলে, কিন্তু মন দেয় না। দেবেই বা কেন? লেখক তো একজন অশরীরী পুরুষ, যাকে দেখতে পাওয়া যায় শুধু ছাপা অক্ষরের মধ্যে।

বিশাখার কোলে মাথা রেখে শোওয়া আমার আর হবে না। তার ওষ্ঠ চুম্বনের আকাঙ্ক্ষা আমায় তৃষ্ণার্ত রেখে দেবে বহুকাল, কিন্তু ঐ ওষ্ঠের জন্য আমি আর কখনো লোভ করব না। আমি সুন্দর দৃশ্য ভালোবাসি। ট্যাক্সি থেকে ঐ ছেলেটির ঝুঁকে হাত বাড়াবার দৃশ্য এবং বিশাখার কোমলভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়া, এই দৃশ্যটির মধ্যে যে মাধুর্য আছে, তা একটি বাঁধানো ছবির মতো দুলতে থাকে আমার চোখের সামনে। আমি এই দৃশ্যটি জমিয়ে রেখে দেব। বিশাখার বন্ধুটিকেও আমি পছন্দ করে ফেললাম।

ট্যাক্সিটা চলে যাবার পর আমি রাস্তা পেরিয়ে এলাম। রণদেবের বাড়ির সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠছি, দেখলাম বিশাখা নেমে আসছে তরতর করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হলো?

বিশাখা আমাকে দেখে একটু চমকে উঠল কিন্তু অন্যদিন আমার দিকে যে বিশেষ মনোযোগ দেয়, সেদিন তা দিতে পারল না। তার শরীরে দারুণ ব্যস্ততা।

—চলে যাচ্ছ যে?

—ওরা নেই।

—কেউ নেই?

—না, দাদা অফিসের কাজে বাইরে গেছে, বৌদিও তাই ক'দিনের জন্য গেছে

বাপের বাড়ি। পাশের ফ্ল্যাটের লোকদের কাছে শুনলাম।

আমি বোধহয় বিশাখার রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছিলাম। বিশাখা চঞ্চলভাবে বলল, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে—আমি এক জায়গায় একটা জিনিস ফেলে এসেছি।

বিশাখা নিশ্চয়ই ভাবছে, এখনো তাড়াতাড়ি গেলে সে তার বন্ধুকে ধরতে পারবে। কিন্তু আমি তো ট্যাক্সিটা চলে যেতে দেখেছি।

বললাম, তুমি কোথায় যাবে, বিশাখা? আমি তোমায় পৌঁছে দেব?

বিশাখা তাড়াতাড়ি বলল, না, না, তার দরকার নেই।

আমি দেয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়ালাম, বিশাখা ছটফটিয়ে নেমে গেল। একেবারে সিঁড়ির শেষ ধাপে গিয়ে একবার মুহূর্তের জন্য ফিরে ও বলল, আর একদিন!

কেন বিশাখা বলল, আর একদিন? কী আর একদিন? আমি নিচে নেমে আর বিশাখাকে দেখতে পেলাম না। ওর বন্ধু কি ট্যাক্সি নিয়ে সত্যিই দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে? কিংবা বিশাখাই আর একটি ট্যাক্সি নিয়ে অনুসরণ করেছে এরই মধ্যে? বিশাখা যেন একটা রঙীন পাখি, ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে গেছে কোথায়!

বিশাখাদের বাড়িতে কিন্তু এরপরেও একদিন যাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। তিনদিনের মধ্যেই। অলকা দেবী লোক পাঠিয়ে নেমন্তন্ন করেছিলেন আমাকে আর দেবরাজকে। ওঁদের বিবাহের তিরিশ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে উৎসব। খাওয়া-দাওয়া তো আছেই, সেই সঙ্গে গানের আসর।

দেবরাজ জিজ্ঞেস করল, কী উপহার দিবি?

আমি মুচকি হেসে বললাম, বই! বই দিলে কেমন হয়?

দেবরাজ বলল, আবার কেউ বই দিলে শিবশঙ্কর লাহিড়ী মারতে তাড়া করে আসবেন।

—ইস, মধুবনীর ছবি দুটো তুই আগেই কেন দিয়ে দিলি? এখন দিলে কাজ হয়ে যেত।

—তা হলে গিয়ে কাজ নেই। বিবাহ বার্ষিকীর ফাংশনটাই আমার অতি বাজে লাগে। লোককে ঘটা করে দেখানো, দেখো দেখো, বিয়ের তিরিশ বছর পরেও আমরা কত সুখে আছি!

আমি তবু জোর করে বললাম, না, তবু চল, ঘুরে আসি। গিয়েই ভিড়ের মধ্যে মিশে যাব, কেউ বুঝতে পারবে না উপহার এনেছি কিনা।

দেবরাজ সরু চোখে তাকাল আমার দিকে। আমি আবার অনুনয় করে বললাম, চল, চল, আর বোধহয় ও-বাড়িতে কোনদিন যাওয়া হবে না, একবার অন্তত ঘুরে আসি। তা ছাড়া, নিশ্চয়ই খুব ভালো খাওয়াবে।

যতই দূর সম্পর্কের হোক, তবু জ্যাঠামশাই বলে ডাকি এমন একজন মানুষ

একটি সিনেমা হলের সামনে বসে অনশন করছেন, আর সেই সিনেমা হলের মালিকের বাড়ির উৎসবে আমি যেতে চাইছি ভালো ভালো খাদ্যের লোভে, এটা একটা নিষ্ঠুর বা বীভৎস ব্যাপার মনে হতে পারে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে হয়েছিল ঠিকই, শুধু বিশাখাকে আর একবার দেখার জন্য। খাবারের কথাটা তুলেছিলাম দেবরাজকে আকৃষ্ট করতে।

শেষ পর্যন্ত আমরা কিনে নিয়ে গেলাম পাচ টাকার ফুল। কিন্তু ওদের বাড়িতে উপস্থিত হয়েই বুঝলাম, আমাদের পাঁচটা টাকাই গচ্চা গেছে। এইসব উৎসব-বাড়িতে ফুলের বড় অপমান হয়। বহুলোক গাদা গাদা ফুল নিয়ে গেছে, অত ফুল সাজাবারও সময় নেই কারুর, ঘরের কোণে ফুলগুলো ডাই করা আছে। সেই ফুলের স্তূপে মিশে গেল আমাদেরটাও। না নিয়ে গেলেও কোন ক্ষতি ছিল না।

এই সামান্য উপলক্ষে এক এলাহী কারবার। ছাদে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে, নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা তিন-চার শো। এই একদিনেই নিশ্চয়ই অন্তত চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ। কিংবা আরও বেশি! এত ভিড়ের মধ্যে আমরা পাত্তাই পেলাম না। বিশাখার সঙ্গে দেখা হলো মাত্র এক ঝলক। বিশাখার প্রচুর বন্ধু-বান্ধবী এসেছে, তার সেই ট্যাক্সির বন্ধুটিকেও দেখলাম। সিঁড়ি দিয়ে সিল্কের কাপড় শপশপিয়ে নামছিল বিশাখা, আমাদের দু'জনকে দেখে জিজ্ঞেস করল, খেয়েছেন তো? আমরা ঘাড় হেলালাম। বিশাখা নেমে গেল। বরং বিশাখার মা অলকা দেবীর সঙ্গে দেবরাজ গল্প করল পনেরো মিনিট। কী নরম, মিষ্টি করে হাসেন মহিলা, মনেই হয় না পাঁচটি সন্তানের জননী, মনে হয় প্রেমিকার মতন।

বিশাখার চার বোনই আজ এক সঙ্গে উপস্থিত। প্রত্যেকে নতুন শাড়ি পরেছে। বাবা-মায়ের বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে তারা উপহার পেয়েছে নতুন শাড়ি। শুধু অনুপস্থিত বাড়ির বড় ছেলে। কেউ উচ্চারণও করছে না তার কথা। রণদেব কি এই কারণেই এই সময় কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে?

কেটে পড়বার তালে ছিলাম, সুজিত ধরে ফেলে বলল, গান শুনবি না? এক বড় ওস্তাদ গাইবেন, উনি এসে গেছেন। চল—

গানের ব্যবস্থা হয়েছে ছাদে। তখন তবলা ঠোকাঠুকি চলছে। কয়েকজন সমবয়সী লোকের সঙ্গে শিবশঙ্কর লাহিড়ী বসে আছেন সেখানে। আমাদের দিকে তাকিয়ে শুধু চেনার ভঙ্গি করলেন তিনি। আমরা এককোণে বসে পড়লাম।

গান শুরু হবার পর খানিক বাদে, আমি শুধু চেয়ে রইলাম শিবশঙ্কর লাহিড়ীর দিকে। তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে চোখ বুজে মাথা দোলাচ্ছেন। মানুষটি প্রকৃত সঙ্গীতরসিক যে, তা বোঝা যায়। এই লোকটির জন্য আজ বারো-তেরোটি পরিবার ধ্বংসের মুখে, কিন্তু সেদিকে এঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। ইনি পাঁচ-সাত হাজার টাকা খরচ

করে এক সন্ধেবেলা লোকদের ডেকে খাওয়াতে পারেন। শুনেছি, বিভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ইনি উদার হাতে চাঁদা দেন, গানবাজনা সম্পর্কে গভীর আগ্রহ! এঁর মেয়েরা সরল, সুন্দর। এঁর স্ত্রী মমতা ও লাবণ্যের প্রতিমূর্তি। যে-কোন লোক দেখে বলবে, এটি একটি চমৎকার পরিবার। অথচ এই পরিবারটিই আরো দশ-বারোটি পরিবারের সর্বনাশের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। শহরের তিনশো চারশো জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে অভিনন্দন জানিয়েছেন শিবশঙ্কর লাহিড়ীকে। কিন্তু ইনি অঙ্গুলি হেলন করেননি বলে ছন্দা নামে একটি মেয়ে হয় আত্মহত্যা করবে, নয় বেশ্যা হয়ে যাবে।

ওস্তাদ তাঁর ঐশ্বরিক কণ্ঠে গান গেয়ে চলেছেন। কিন্তু আমার আর গান শুনতে ভালো লাগল না। সত্যিই, যত মহৎ শিল্পীই হোক, তা সব সময় মানুষের সব সমস্যা ভুলিয়ে দিতে পারে না। যে-কোন কারণেই হোক, ছন্দার বিষণ্ণ মুখটা আমার বারবার মনে পড়ছিল। আমি দেখতে এসেছি বিশাখাকে, কিন্তু মনে পড়ছে ছন্দার কথা।

ঠিক সেই মুহূর্তে, সেই জায়গা থেকে অনেক দূরে একটি ঘটনা ঘটল। ঘটনাটি অতিনাটকীয় বা একে প্রকৃতির পরিহাসও বলা যেতে পারে। ঘটনাটির কথা জানতে পেরেছিলাম কয়েকদিন পরে, কিন্তু সেটি এখানে বর্ণনা করাই মানানসই হবে।

অফিসের কাজে রণদেব গিয়েছিল হলদিয়া। সেখান থেকে কুঁকড়াহাটি এসে সে নদী পার হয়। শেষ ফেরিতে আসায় তার বেশ রাত হয়েছিল। তখনো সে ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরতে পারত, কিন্তু ফেরার খুব ইচ্ছে ছিল না। কারণ, সে জানে, সেদিনই তার বাবা-মা নির্লজ্জভাবে বিবাহ বার্ষিকীর উৎসবে দু-পাঁচশো লোককে খাওয়াচ্ছে। কথাটা ভাবলেই তার রাগ হয়। সে ঠিক করল, সাগরিকায় থেকে যাবে এক রাত। এই সামান্য সিদ্ধান্তের জন্য তার জীবনটা বদলে গেল পুরোপুরি। সাগরিকার রিসেপশান কাউন্টারে দেখা হয়ে গেল তার কোম্পানির এক স্থানীয় ডিলারের সঙ্গে। সেই লোকটি বেশ জাঁহাবাজ ধরনের, নিজের গাড়ি আছে। সে বলল, মিঃ লাহিড়ী, আপনি এখানে থাকবেন কেন? আমার সঙ্গে চলুন না, আমরা মাছ ধরতে যাচ্ছি। একেবারে সুন্দরবনের ভেতরের দিকে চলে যাব। লঞ্চ ঠিক করা আছে। এখন গিয়ে লঞ্চে থাকব রাতটুকু, তারপর বেরিয়ে পড়ব ভোরবেলা।

রণদেবের পছন্দ হয়ে গেল প্ল্যানটা। মন্দ নয়, বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে! সাগরিকা থেকে খাবার-দাবারের কিছু প্যাকেট নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল একটু বাদেই।

গাড়িতে রণদেব ছাড়া আর রয়েছে ডিলার ঘোষ আর তার এক বন্ধু সামন্ত।

গাড়ি কাকদ্বীপের কাছাকাছি এসেছে, কুচকুচে অন্ধকার রাস্তায় হঠাৎ হেডলাইটের আলোয় চোখে পড়ল, খুব সামনে দিয়ে সাঁৎ করে ছুটে গেল একটি ছায়ামূর্তি। মানুষ না প্রেত? মুখখানা বালকের মতন, কিন্তু মুখখানায় বালকত্ব একটুও নেই, বহুকালের একটা শুকনো মুখ। তারপরই একটা আর্তনাদ।

ঘোষ প্রাণপণে ব্রেক চেপে ধরেছে, বিপজ্জনকভাবে টাল খেয়ে গাড়িটা থেমে গেল। রণদেব ফ্যাকাসে মুখে বলল, লোকটা চাপা পড়েছে? ঘোষ ঝট করে নেমে গেল গাড়ি থেকে। রণদেবও এল তার পিছু পিছু। অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায় রাস্তার পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে মানুষের মতন একটা কিছু। ঘোষ বিড়বিড় করে বলল, কিন্তু আমার গাড়ির সঙ্গে তো কিছু লাগে নি, তা হলে টের পেতাম। এই সামন্ত, টর্চটা নিয়ে আয় তো?

সামন্ত টর্চ নিয়ে দৌড়ে এল। রাস্তায় শুয়ে আছে একজন পুঁয়ে-পাওয়া লোক, সমস্ত শরীরটা শুকনো, বালকের আকৃতিতে এক বয়স্ক, কিন্তু কোন আঘাতের চিহ্ন বা রক্ত নেই। রণদেব নিচু হয়ে লোকটিকে ধরে তুলতে গেল, তারপর আর সময় পেল না।

রাস্তার পাশের অন্ধকার থেকে নিঃশব্দে উঠে এসেছে তিনজন লোক, তাদের হাতে লোহার ডাণ্ডা। এক সঙ্গে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল, এরা প্রতিরোধ করার বিন্দুমাত্র সুযোগও পেল না।

আক্রমণকারীদের মধ্যে একজনের পা খোড়া, তার মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, সে হাতের ডাণ্ডাটা ঘুরিয়ে মারল রণদেবের মুখে। দু'হাতে মুখ চেপে ধরার আগের মুহূর্তে রণদেব দেখল তার আততায়ীর হিংস্র মুখখানা। কেউ কারুকে চিনতে পারল না।

রক্তে ভাসানো শরীরে তিনজন রাস্তার ওপর চিৎপাত হবার পর ডাকাতেরা চটপট ওদের পকেট খালি করতে লাগল। তারপর তছনছ করতে লাগল গাড়ির জিনিসপত্র। খোঁড়া ডাকাতটি পেয়ে গেল খাবারের প্যাকেটগুলো। একটু পরে, মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়ে পালাতে পালাতে তার আর তর সইলো না, সেই ছুটন্ত অবস্থাতেই সে গপ্‌গপ করে গিলতে লাগল প্যাকেট-খোলা খাদ্য।

রণদেব মরেনি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটা জিপ এসে পড়ায় ওরা বেঁচে গেল। কিন্তু রণদেবের একটা চোখকে কিছুতেই রক্ষা করা গেল না এবং দুটি পাঁজরা ভেঙে যাওয়ায় সে আর সারাজীবনে কখনো স্বাভাবিকভাবে সিঁড়ি ভেঙে দোতলা-তিনতলায় উঠতে পারেনি।

হারাণ ধরা পড়ে এর ন'দিন বাদে। পুলিশের হাতে মার খেয়ে তার হাড়-পাঁজরাও কিছু আস্ত থাকেনি। এবং তার আট বছর কারাদণ্ড হয়েছিল।

৮

রোহিণী সিনেমা হলের ধর্মঘট মিটে গেছে। শিবশঙ্কর লাহিড়ী নত হননি, ধর্মঘটীদের মধ্যেই দু' তিনজন লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে পা জড়িয়ে ধরে। এতে অবশ্য তাদের হীন মনে করার কারণ নেই। ধর্মঘটীদের অনেকের বাড়িতেই তিন-চার বছরের শিশু আছে। শিশুর কষ্ট সহ্য করা এমনকি মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। ওটা অ্যানিম্যাল ইনসটিংক্ট। রোহিণীর কর্মীদের সমর্থনে একদিন সারা কলকাতার সমস্ত সিনেমা হলে ধর্মঘট হয়ে গিয়েছিল। তাতেও শিবশঙ্কর লাহিড়ী জব্দ না হওয়ায় এরা ভেঙে পড়েছিল একেবারে।

কর্মীরা এসে একবার ক্ষমা চাইবার পর শিবশঙ্কর লাহিড়ী আবার উদার হয়ে উঠেছেন। তিনি একজনকেও ছাঁটাই করেননি, সকলকেই মাইনে দিয়ে দিয়েছেন তিন মাসের! তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আগামী বছর পে-স্কেল রিভাইজ করবেন।

যথারীতি একটি ফাটাফাটি হিন্দী ছবি মুক্তি পেল সেখানে। উদ্বোধনের দিন প্রচুর ফুল দিয়ে সাজানো হলো গেট, অনেকদিন পর রোহিণী হলে ঝলমল করল আলো। বোম্বাই-এর এক নায়িকার দৈত্যকন্যার মতো বিরাট ছবি জুড়ে রইল সামনের দেয়াল। মালিকের পয়সায় সন্দেশ ও সরবৎ খেল কর্মচারীরা। শুধু একজন সেখানে অনুপস্থিত। আমার রমেশ জ্যাঠা।

রমেশ জ্যাঠা চিরকাল হেরে যাওয়ার দলে। যখন সবাই জেতে, তখনও তিনি হারেন। প্রায় আট মাস ধরে ধর্মঘট চালিয়ে এসে, যখন বিনাশর্তে মিটে গেল, সবাই জানল, কর্মীদেরই জয় হয়েছে, সেই সময় রমেশ জ্যাঠা চাকরিটি হারালেন।

মালিকের কাছ থেকে তিন মাসের মাইনে একসঙ্গে পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে রমেশ জ্যাঠা মস্ত বড় এক ভাঁড় কষা মাংস কিনলেন পাঞ্জাবীর দোকান থেকে। বেলেঘাটা বাজারের সামনে থেকে কিনলেন পাচ টাকার ল্যাংড়া আম। তারপর খানিকটা চলে এসে, আবার ফিরে গিয়ে বাজারের মধ্যে ঢুকে কিনে ফেললেন একটা আস্ত ইলিশ। দু'হাতে সেগুলো নিয়ে সগর্বে হাঁটতে লাগলেন রাস্তা দিয়ে।

বাড়ি ফিরেই চাল-ডাল, তেল-নুন আনানো হলো ছোট মেয়েকে দিয়ে। বিভিন্ন পদ রান্নার দেরি সইবে না বলে খিচুড়ি চাপিয়ে দেওয়া হলো। ইতিমধ্যে রমেশ জ্যাঠামশাই একাই দুটি ল্যাংড়া শেষ করে ফেললেন। সেদিন সন্ধে-রাত্রে ঐ বাড়িতে রীতিমতন একটা ভোজ হলো। নিচতলার যে ভাড়াটে ভদ্রলোকটির পিঠে সরষের তেল মাখার বাতিক আছে, সে একবার ওপরে উঠে এসেছিল

জ্যাঠামশাইকে শুভেচ্ছা জানাতে। সরমা জ্যাঠাইমা তাকেও দিলেন এক বাটি খিচুড়ি।

সেইদিন শেষরাত্রে রমেশ জ্যাঠামশাইয়ের সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস হলো। সত্তর বছর বয়সেও যে-মানুষ রাস্তার ওপর বসে দাপটে অনশন চালিয়ে গেছেন, তিনি সহ্য করতে পারলেন না পেট ভরে খাওয়ার সুখ। বিছানার ওপরে হঠাৎ দাপিয়ে উঠে ফাটা গলায় চিৎকার করলেন, ওঃ! ওরে, মা, গেলাম, গেলাম, মা, তুমি কোথায়? মা—।

রমেশ জ্যাঠার মা মারা গেছেন প্রায় তাঁর ছেলের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই। তবু এতকাল পরে রমেশ জ্যাঠা কেন মাকে ডাকতে লাগলেন, কে জানে!

সেটাই রমেশ জ্যাঠার শেষ কথা।

না, তিনি মারা গেলেন না। মরে গেলে তো ব্যাপারটা অনেক সরল হয়ে যায়। তা ছাড়া, তিনি যদি অনশন চলাকালীন মরতে পারতেন, তাহলে সেটাই হতো তাঁর পক্ষে সবচেয়ে সুযোগ্য মৃত্যু। একটা হৈ-চৈ পড়ে যেত নিশ্চয়ই, রমেশ জ্যাঠা পেতেন বীরের সম্মান, এমনকি খবরের কাগজে ছবি বেরিয়ে যেতেও পারত। তাঁর মর্তি তৈরি না হলেও তাঁর একটা বাঁধানো ছবি অন্তত ঝুলত রোহিণী হলে। বলা যায় না, সহানুভূতির বন্যায় কিছু টাকা-পয়সাও ভেসে আসতে পারত তাঁর পরিবারের দিকে। কিন্তু রমেশ জ্যাঠা চিরকালের হতভাগ্য। এ গৌরবও তিনি পেলেন না। একজন সত্তর বছরের বুড়ো লোকের যদি বাড়িতে শুয়ে-শুয়ে করোনারি থ্রম্বোসিস হয়, তার মধ্যে আর বিশেষত্ব কী আছে?

তিনি মরলেন না। সেই রাত্রে তাঁর মেয়েরা বেশ কয়েক ঘটি জল ঢেলে মাথা ধুইয়ে দিল, স্ত্রী হাত বুলিয়ে দিল বুকে। তাঁর নিশ্বাস পড়ছে অথচ তিনি আর কথা বলছেন না দেখে সবাই ভাবল, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। পরদিন সকালে ডেকে আনা হলো পাড়ার একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে। তিনি গম্ভীরভাবে পাঁচ পুরিয়া ওষুধ দিয়ে যাবার সময় বললেন, একে হাসপাতালে পাঠালে ভালো হয়। বিকেলে ডাকা হলো একজন অ্যালোপ্যাথকে, কারণ সারাদিনের মধ্যে জ্যাঠামশাই চোখ চেয়ে থেকেও আর একটিও কথা বলেননি। অ্যালোপ্যাথটি রোগীর সামনেই বেশ জোরে জোরে বললেন, এঁর সারা শরীরে প্যারালিসিস হয়ে গেছে, ইনি আর কথা বলতেও পারবেন না, কিছু শুনতেও পাবেন না। ইচ্ছে করলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেন, তবে আমার মনে হয়, যে-ক'টা দিন আছেন বাড়িতেই শান্তিতে থাকতে দিন।

রমেশ জ্যাঠার বাড়িতে আমার আর যাবার প্রয়োজন ছিল না কোনদিন। তাঁর এই অবস্থার কথা আমি হয়তো জানতেও পারতাম না। কাগজে দেখেছি, রোহিণী

হলের ধর্মঘট মিটে গেছে, ব্যস নিশ্চিন্ত, সব শান্তি। মায়ের দেওয়া সেই পুরনো শাড়ি আর টাকা এর আগেই আমাদের বাড়ির চাকরের হাত দিয়ে, মায়ের বয়ানে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তবু আমাকে যেতে হয়েছিল আরো দু'বার।

আমাকে বিপদে ফেললেন, ছোট মাসীর বান্ধবী সেই কর্নেল-পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা চৌধুরী। তিনি হঠাৎ আমাকে একটি চিঠি পাঠালেন। তিনি যে ক'টি মেয়েকে সিলেক্ট করেছিলেন, তাদের মধ্যে একটি মেয়ে হঠাৎ বিয়ে করে পাঞ্জাব চলে গেছে বলে সে কাজ নেবে না, সেই জায়গায় আমার চেনা মেয়েটিকে তিনি নিতে পারেন। আরো অনেক প্রার্থিনী রয়েছে, কিন্তু আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলাম বলেই তিনি এই সুযোগ দিচ্ছেন। আমি যেন অবিলম্বে মেয়েটিকে নিয়ে তাঁদের মহিলা আশ্রমে দেখা করি।

চিঠিটা পেয়ে আমি বিরক্তই বোধ করলাম প্রথমে। ও-ব্যাপারে আমার আগ্রহ কমে গেছে। অন্য লোকদের ব্যাপার নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামানো আমার স্বভাব নয়। তা ছাড়া তখন অবস্থাটা ছিল অন্যরকম।

তবু ভাবলাম, রমেশ জ্যাঠা চাকরি ফিরে পেলেও পরিবারটা অনাহার থেকে বাঁচবে কিন্তু দারিদ্র্য তো ঘুচবে না। ছন্দা মেয়েটি যদি আলাদা স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে!

খানিকটা অনিচ্ছা নিয়েই যেতে হলো এক সন্ধেবেলা। সেদিনও দেখলাম, রমেশ জ্যাঠার ছোট মেয়ে নিচতলার ভাড়াটের ঘরে বসে আছে। আমাকে দেখে সে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বহু লোকের গলার আওয়াজ পেলাম। কয়েকটা বাচ্চা হুটোপুটি করছে। রমেশ জ্যাঠার কণ্ঠস্বর না পেয়ে ভেবেছিলাম, তিনি নিশ্চয়ই সিনেমা হলে ডিউটি দিতে গেছেন। ওপরে এসে আমি প্রকৃত দৃশ্যটি দেখলাম।

ভেতরের ঘরের খাটে বিসদৃশভাবে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে সেই বৃদ্ধের কঙ্কাল। চোখ দুটি ড্যাবডেবে। আমাকে দেখে মনে হলো চিনতে পেরেছেন, একটি হাত তোলবার চেষ্টা করলেন, একটু উঠেই ধপ করে পড়ে গেল।

আজ রমেশ জ্যাঠার সব মেয়ে উপস্থিত। বড় মেয়ে কেতকীকে দেখলাম, রোগা জিরজিরে, ঠিক মনে হয় সূতিকার রুগী, তার তিনটি ছেলেমেয়ে এইটুকু জায়গার মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করছে। এই কেতকীর সঙ্গে আমি ছেলেবেলায় খেলা করেছিলাম। দারুণ গাট্টা-গোট্টা স্বাস্থ্য ছিল, মনে আছে। চোর-চোর খেলার সময় ছাদে আমি ওকে চেপে জড়িয়ে ধরেছিলাম, আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে পালিয়ে ছিল। এখন ওর বয়েস কত হবে, পঁচিশ, ছাব্বিশের বেশি নয়, কিন্তু ওর দিকে

তাকাতেই ইচ্ছে করে না। এর কারণ কী, শুধু দারিদ্র্য? বাঙালি মেয়েরা অনেকেই জানে না, কী করে স্বাস্থ্য রাখতে হয়।

কেতকী চি চি করা গলায় বলল, নীলুদা ভালো আছ?

আমি সংক্ষেপে দু' কথায় আলাপ সেরে ফেললাম। কেতকীর স্বামী রাইটার্স বিল্ডিংসে রেকর্ড সাপ্লায়ারের কাজ করে, অর্থাৎ কেরানীর চেয়েও ছোটি চাকরি। এর মধ্যেই তিনটি সন্তান, আরো হবে নিশ্চয়ই।

কেতকীর পরের বোন দীপ্তির চেহারায় খানিকটা চাকচিক্য আছে, ব্যবহারও বেশ সপ্রতিভ। রমেশ জ্যাঠা বলেছিলেন, ও যেন কোথায় কাজ করতে যায়। ছন্দা বলেছিল, বেশ্যা! তার দিকে আমি ভালো করে তাকাতে পারলাম না। সেও বিশেষ আমল দিল না আমাকে।

এমনকি ছন্দাও আমাকে বিশেষ কোন অভ্যর্থনা জানাল না। এ-বাড়ির চেহারা যেন হঠাৎ বদলে গেছে। বদলে গেছে ছন্দাও। সে একটা নতুন লাল রঙের শাড়ি আর নতুন ব্লাউজ পরে আছে। একবার সে আমার চোখের দিকে তাকাল। জ্বলন্ত দৃষ্টি। বুঝলাম, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আমি কথা রাখতে পারিনি ; ছন্দাও মরতে পারেনি, বোধহয় বেছে নিয়েছে অন্য পথ।

পরক্ষণেই আমি ভাবলাম, যদি ছন্দা একজন দু'জনের কাছে তার শরীর বিক্রি করে থাকে, তাতেই বা ক্ষতি কী? এখনো তো সে ইচ্ছে করলে অন্যরকম জীবন পেতে পারে। অন্য লোকের সঙ্গে দু-একবার শুলে কী আসে-যায়! যত সব মধ্যবিত্ত সংস্কার!

আমি ছন্দাকে ডেকে প্রতিভা চৌধুরীর চিঠিটা দিয়ে বললাম, তুমি এখানে গিয়ে দেখা করতে পার। একটা কাজ হয়ে যাবে, মাইনে অবশ্য খুব বেশি নয়!

ছন্দা ঈষৎ ব্যঙ্গের সঙ্গে বলল, এজন্য আপনাকে খুব কষ্ট করতে হয়েছে বুঝি?

আমি ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বললাম, না না! ভেবে দেখ, যদি তোমার ইচ্ছে হয়—

ছন্দা চিঠিটা খুলেও দেখল না। অবহেলার সঙ্গে রাখল খাটের ওপর।

আমি বললাম, ওখানে থাকবারও ব্যবস্থা আছে। অবশ্য তুমি বাড়ি থেকেও যাতায়াত করতে পার।

ছন্দা ভালো করে শুনলই না আমার কথা। উঠে চলে গেল ঘরের বাইরে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

ঘরের মধ্যে আরো দু'জন অপরিচিত যুবক বসে চা খাচ্ছে। তারা আড়চোখে দেখছে আমাকে। এ-বাড়িতে দু'টি যুবতী মেয়ে আছে, ছোট মেয়েটিও শিগগিরই

তৈরি হয়ে যাবে, সুতরাং এরকম শুভার্থীর আনাগোনা এখন হতেই থাকবে। রমেশ জ্যাঠামশাইয়ের যখন উপার্জন ছিল না, তখনও বাড়িতে ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ, কেউ তাঁর মুখের ওপর কথা বলতে পারত না। এখন তাঁর সামনেই তাঁর মেয়েরা পাড়ার দাদাদের চা খাওয়াচ্ছে। জ্যাঠামশাইয়ের চোখের তারা দুটি এদিক-ওদিক করছে মাঝে মাঝে, তিনি একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারছেন না। মানুষের এত অসহায় মুখ আমি দেখিনি কখনো।

জ্যাঠামশাইয়ের বালিশের পাশে ছড়ানো কয়েকটা ছবির অ্যালবাম। এক সময় ওঁর ফটোগ্রাফির শখ ছিল, নিজে ক্যামেরার দোকান করেছিলেন, আমার মনে পড়ল। অ্যালবামের কয়েকটি পাতা উল্টে-উল্টে দেখলাম। সত্যি, বেশ ভালো ছবি তুলতেন উনি। অধিকাংশই জলের ছবি। গঙ্গা, অন্যান্য নদী, সমুদ্র। শুধু এই রকম ছবি তুলেই আজকাল কত লোক বিখ্যাত হয়। জ্যাঠামশাই পারলেন না। পুরোনো সব ছবি দেখে যদি জ্যাঠামশাইয়ের মুখে হঠাৎ কথা ফোটে, সেইজন্য অ্যালবামগুলো এখানে রাখা হয়েছে।

একটি ছবিতে আমার চোখ আটকে গেল। কোন এক নদীর ধারে মাথায় আধো ঘোমটা দেওয়া এক রমণী, মুখে আভিজাতের ছাপ। তাঁর দু'পাশে দাঁড়ানো কয়েকটি ছেলেমেয়ে। ছেলেটির মাথা ন্যাড়া। তিনটি ফুটফুটে কচি মুখের বালিকা। নদীর তরঙ্গে ঝকঝকে আলো। একটু চেষ্টা করেই চিনতে পারলাম। সরমা জ্যাঠাইমা, হারাণ আর তার তিন বোন। ছোট মেয়েটি বোধ হয় তখনো জন্মায়নি। আমি মুখ তুলে সেই তিনটি মেয়ের জীবন্ত মুখ দেখলাম। ঐ ছবির মেয়েরা কোথায় হারিয়ে গেছে!

আর জ্যাঠাইমা? দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন তিনি। মুখখানা ঠিক পাথরের মতন, এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি। গান্ধারীর মতন উনিও বোধহয় অনুসরণ করছেন স্বামীকে।

এখানে আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করল না। উঠে গিয়ে জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করলাম, ওর বসে-থাকা অবস্থায় ছড়ানো পায়ে। মনে মনে বললাম, জ্যাঠাইমা, আপনি বরং আগেই মরে যান। আর কত নোংরা দৃশ্য দেখবেন? এই ঘরে আপনাকে একেবারেই মানায় না!

৯

বিশাখার সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল রাস্তায়। মানিকতলার কাছে, বিকেলের দিকে। রাস্তায় তখন দারুণ ভিড়, তার মধ্যেও বিশাখাকে দেখে মনে হলো, সমস্ত রাস্তাটা নীল রঙের আলোয় ভরে গেছে। আমার কখনো কখনো এরকম মনে হয়।

আমি নিজেই হনহন করে এগিয়ে বিশাখার কাছে গিয়ে বললাম, কোথায় যাচ্ছ?

বিশাখা সামান্য চমকে উঠল। তারপর অনুযোগের সুরে বলল, দেখুন না, এখানে এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছিলাম, তারপর বাসে উঠতে পারছি না, ট্যাক্সি ধরতে পারছি না, এই সময় না এলেই হতো!

আমি বললাম, দাড়াও, আমি ট্যাক্সি ধরে দিচ্ছি।

দু-একটা ট্যাক্সির পেছনে ছোটাছুটি করেও কোন লাভ হলো না। বাসেও অসম্ভব ভিড়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই হবে। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার দাদা কেমন আছে?

রণদেব গুরুতরভাবে আহত হলেও একটা সুসংবাদ আছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর রণদেবকে তার বাবা নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছেন। রণদেবের আর প্রাণের আশঙ্কা নেই। বিশাখার কাছেই জানলাম, আরো ভালো চিকিৎসার জন্য তাকে রাশিয়া পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

বিশাখা বলল, চলুন, আমাদের বাড়ি যাবেন? দাদাকে দেখে আসবেন?

আমি বললাম, আর একদিন।

তারপর একটু হাসলাম।

বিশাখা জিজ্ঞেস করল, হাসলেন কেন?

—তোমার মনে আছে, রণদেবের ফ্লাটবাড়ির সিড়িতে তোমার সঙ্গে একদিন দেখা হলো, তুমি খুব ব্যস্ত ছিলে, একদম সিড়ির শেষ ধাপে নেমে গিয়ে তুমি বলেছিলে, আর একদিন!

—ও, সেদিন! সেদিন একজনের সঙ্গে দেখা করার খুব দরকার ছিল।

—তুমি বলেছিলে, তুমি একটা জিনিস হারিয়েছ।

—ঠিক হারায়নি, মানে জিনিসটা একজনের কাছে ছিল, সেটা নেবার জন্যই...

—সেই একজনকে আমি দেখেছি। খুব সুন্দর ছেলে।

ভেবেছিলাম, বিশাখা একটু লজ্জা পাবে। কিন্তু ও সম্পূর্ণ চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে। কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল। আগেকার দিনের উপন্যাসে

আয়ত চোখ মেলে তাকানোর কথা দেখেছি অনেকবার। কথাটার ঠিক মানে জানি না। এই কি সেই আয়ত চোখ?

—দেখেছেন ওকে? ওর নাম প্রদীপ্ত।

—তোমার খুব বন্ধু?

—হ্যাঁ। জানেন, ওরা ব্রাহ্ম!

বিশাখা এমনভাবে বলল, যেন এটা একটা দারুণ ঘটনা! আমিও ছদ্মকৌতুকে বললাম, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আপনি কোন ব্রাহ্মকে চেনেন?

—ঠিক মনে করতে পারছি না। আজকাল তো ব্রাহ্মদের আলাদা করে চেনা যায় না!

—খুব যায়। ওদের বাড়িতে গেলে বুঝতেন। দারুণ গোড়া, নিয়মিত প্রার্থনা হয়।

আর একটি ট্যাক্সিকে ধরবার জন্য আমি ছুটে গেলাম। ট্যাক্সিটি যাত্রীহীন ছিল, তবু কোন দুর্বোধ্য কারণে যেতে চায় না।

বিশাখা বলল, কতক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে হবে কী জানি! তার চেয়ে বরং হেটে গেলে...আপনি একটু হাটবেন আমার সঙ্গে? আপনার কাজ আছে?

বিশাখাই প্রস্তাবটা দিল বলে আমি খুশি হয়ে উঠলাম। হাজার কাজ থাকলেও তুচ্ছ করতে পারতাম আমি।

বললাম, তা হলে চলো, বা দিক দিয়ে যাই, কাকুড়গাছি, ফুলবাগান হয়ে?

—ওদিক দিয়ে গেলে তো অনেকটা ঘোরা হয়ে যাবে.

—তা হোক না, ওদিকের রাস্তা ভালো। তা হলে শুধু হাঁটা হবে না, বেড়ানোও হবে। তোমার খুব তাড়া আছে কি?

—না, চলুন।

বিশাখার সঙ্গে একদিন আমার বেড়াবার শখ ছিল, এই তো মিটে গেল। চুম্বন কিংবা কোলে মাথা দিয়ে শোওয়া নাই-বা হলো।

এখন রাস্তায় চেনাশুনো কারুর সঙ্গে দেখা না হলেই বাঁচি! কারুর কারুর সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। তারা আর কিছুতেই পিছু ছাড়ে না।

বিশাখা বলল, সেদিন আপনার সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হলো, আমি বিশেষ কোন কথা না বলে চলে যাচ্ছিলাম, তাই হঠাৎ মনে হলো, আপনি নিশ্চয়ই মনে কিছু করবেন। তাই বলেছিলাম, আর একদিন আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করব। আপনাকে আমার জীবনের কয়েকটা ঘটনা বলব বলেছিলাম না একদিন? সে তো বলাই হলো না!

বিশাখার বয়েস কুড়ি কিংবা একুশ। এর মধ্যেই ওর জীবনের কয়েকটা ঘটনা জমে গেছে? মেয়েদের জীবনে ঘটনা মানেই সম্ভবত প্রণয় সম্পর্কিত জটিলতার ঘটনা।

জিজ্ঞেস করলাম, প্রদীপ্তরা ব্রাহ্ম তো কী হয়েছে? সেজন্য তোমার এত চিন্তা কেন?

বিশাখা দ্বিধাহীন, জড়তাহীন পরিষ্কার গলায় বলল, আমি তো ওকে বিয়ে করব ঠিক করেছি, এখন নয় অবশ্য, আমার মেজদির বিয়ে হয়ে যাবার পর। কিন্তু প্রদীপ্তর বাবা এমন গোঁড়া যে, ব্রাহ্ম মতে ছাড়া অন্য কোন মতে বিয়েতে রাজি নয়। পুরুত-টুরুত ডেকে বিয়েতে দারুণ আপত্তি। এই নিয়ে নিশ্চয়ই আমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া লেগে যাবে। দাদার বেলায় যেমন হয়েছিল।

—এক কাজ করো না, তোমরা দু'জনেই বাড়ির কারুকে কিছু না বলে একদিন রেজিস্ট্রি বিয়ে করে ফেলো! তারপর বাড়ির লোক যখন জানতে পারবে, তখন একবার তোমাদের বাড়িতে পুরুত ডেকে হিন্দুমতে বিয়ে হবে, আর একবার ওদের বাড়িতে ব্রাহ্ম মতে।

—তা হলে বাবা ভীষণ দুঃখ পাবেন!

—কিছুদিন বাদেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

—বাবাকে আমি কিছুতেই দুঃখ দিতে পারব না। জানেন, এ পৃথিবীতে আমি বোধহয় বাবার চেয়ে আর কারুকেই বেশি ভালোবাসি না। বাবাকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় রাগী, কিন্তু ভেতরটা এত নরম—আজ পর্যন্ত আমাদের কোন রকম ইচ্ছেতে কোন দিন বাধা দেননি!

আমি মনে মনে বললাম, শিবশঙ্কর লাহিড়ী, তুমি ধন্য! তুমি এমন চমৎকার মেয়ের ভালোবাসা পেয়েছ। তারপরই আবার একটা কথা মনে পড়ল।

—বিশাখা, তোমার বৌদি এখন কোথায়?

—কেন, আমাদের বাড়িতে! বাবা তো এখন সব সময় বৌমা বৌমা করছেন। নিজে গিয়ে বৌদির বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছেন বৌদিকে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা ফুলবাগান ছাড়িয়ে ডান দিকে বেঁকে অনেকটা এসে পড়েছি। এ রাস্তায় চেষ্টা করলে ট্যাক্সি পাওয়া যায়, কিন্তু বিশাখা আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে। ওর আর খেয়াল নেই।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা অন্য চিন্তা এল। এ সম্পর্কে আমার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। থমকে দাঁড়িয়ে আমি বিশাখার দিকে চেয়ে রইলাম। একটা হালকা নীল রঙের শাড়ি পরে আছে বিশাখা। গা থেকে ভেসে আসছে মৃদু বিদেশী পারফিউমের সৌরভ। ঝকঝকে তকতকে শরীর, ওর চেহারায় বা চরিত্রে কোন

মালিন্য নেই। চাঁদের উজ্জ্বল দিকটার মতন এরা শুধু পৃথিবীর সুখের দিকটাই জানে।

হয়তো বিশাখার সঙ্গে আমার আর কোনদিন দেখা হবে না। কিংবা হঠাৎ এরকম ভাবে রাস্তায় দেখা হয়ে যেতে পারে। ততদিনে ওর সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা এসে যাবে। তখন দেখা হলে, বড় জোর সামান্য হেসে ঘাড় হেলিয়ে বলবে, ভালো? আমিও ঠিক সেই একই রকম ভঙ্গিতে বলব, ভালো?

আমি কি আজ বিশাখার মনে একটা দাগ কেটে দিতে পারি না?

বিশাখা জিজ্ঞেস করল, কী হলো, থেমে পড়লেন কেন?

—বিশাখা, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে?

—কোথায়?

—কাছেই একটা জায়গায়!

বিশাখার মুখে একটু ছায়া পড়ল। ভালো করে একবার দেখল আমাকে। তারপর আমার চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে মুখ নিচু করে বলল, না, আমি এখন বাড়ি যাব।

—চলো না, খুব কাছে, বেশিক্ষণ লাগবে না।

বিশাখা এবার একটু দৃঢ় গলায় বলল, না, আমি আর কোথাও যাব না। আমি বাড়ি ফিরব। এখান থেকে ট্যাক্সি ভাড়া পাওয়া যায় না?

—যায়। তোমাকে আমি পৌঁছে দেব। তার আগে চলো, একটা জায়গা থেকে ঘুরে যাই।

—কেন?

—বিশাখা, তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ? আমি তো খারাপ লোক নই, আমি ভালো লোক।

—কিন্তু আমি যে বাড়ি যেতে চাই এখন!

—যাবে, দশ মিনিটের বেশি দেরি হবে না। যদি আমায় বিশ্বাস করতে পারো, তা হলে চলো।

—আপনি আমায় কোথায় নিয়ে যেতে চাইছেন?

—বললাম তো, ভয় নেই!

—চলুন।

এবার বিশাখা হাঁটছে অনিশ্চিত পায়ে। ঘন ঘন তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমাকে বুঝবার চেষ্টা করছে। মনের অস্থিরতা চাপা দেবার জন্য একবার সে কথা ঘোরাবার জন্য বলল, দেখুন, দেখুন ঐ ছেলেটাকে।

একটি ভিখিরি-ছেলের দু'টি হাতের পাঞ্জাই কাটা। তবু সেই ঠুঁটো দু' হাতে একটি মাটির হাড়ি বাজাচ্ছে কায়দা করে।

বিশাখা বলল, ইস!

আমি একটু নিষ্ঠুরভাবে বললাম, শুনেছি, কিছু লোক ইচ্ছে করে এইসব ছেলেদের হাত-পা কেটে দিয়ে ভিখিরি বানায়!

বিশাখা চোখ বুজে ফেলল, তারপর বলল, এইসব খারাপ লোক, এদের ধরে ধরে গুলি করে মেরে ফেলে না কেন?

—কে মারবে বলো? তুমি কিংবা আমি মারতে পারব না। কারণ আমাদের সময় নেই, তাই না?

বিশাখা বলল, তবু কিছু একটা করা উচিত। যারা মানুষকে এভাবে কষ্ট দেয়, তারা নিজেরা কি মানুষ?

আমি উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেলাম। সব কথা বিশাখা বুঝবে না। ওর মনটা বড্ড নরম। এরকম নরমই থাকুক না। কী দরকার আঘাত দিয়ে! তা হলে কি ওকে নিয়ে যাব সেখানে? আমি কি নিষ্ঠুরতা করছি?

আবার মনে হলো, যে সুন্দর, তাকে কি দুর্বল হতেই হবে? এই পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে বিশাখাকেও তো দেখতে হবে অনেক কিছু। বরং ওর সুন্দর মনের কিছুটা অংশ অন্যদিকে।

আমি বিশাখাকে ভুলিয়ে-ভালিয়েই নিয়ে আসছিলাম। আগে থেকে বললে বিশাখা কিছুতেই আসত না। বাড়িটার সামনে এসে বিশাখা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, এখানে যাব কেন? এটা কার বাড়ি?

আমি নরম গলায় বললাম, ভয় পেয়ো না, এসো!

হাত দিয়ে দরজাটা ঠেলে খুলে দিলাম। উঠোনে অল্প অল্প আলো। একতলার দুটো ঘরেরই দরজা বন্ধ। দোতলার সিঁড়ির দিকটা অন্ধকার। এরকম বাড়িতে বিশাখা বোধহয় জীবনে কখনো ঢোকেনি। সিঁড়িতে পা দিয়ে ও প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় জিজ্ঞেস করল, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

এবার আমি ওর হাত চেপে ধরে বললাম, আমি কথা দিচ্ছি বিশাখা, তোমার কোন ভয় নেই। এস লক্ষ্মীটি, এক্ষুনি ফিরে যাব।

বিশাখাকে হাত ধরেই নিয়ে এলাম। দোতলায় চটের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলাম, ভেতরটা একেবারে নিস্তব্ধ। আমার বুকটা ধক করে উঠল। একটা আলো পর্যন্ত জ্বলছে না। তবে কি সব শেষ হয়ে গেছে?

আমি ডাকলাম, জ্যাঠাইমা! জ্যাঠাইমা!

একটা আলো জ্বলে উঠল। ডান দিকের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন সরমা জ্যাঠাইমা। সেই রকম পাথরের মতন মুখ। লালপাড় শাড়ি দেখে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম, জ্যাঠামশাই কেমন আছেন?

জ্যাঠাইমা বললেন, এসো!

ঘরের মধ্যে খাটের ওপর ঠিক সেই একই রকমভাবে শুয়ে আছেন রমেশ জ্যাঠামশাই। সেইরকম হাত-পা এদিকে সেদিকে ছড়ানো, চোখ দুটো বিস্ফারিত। কঙ্কাল বুকটা একটু একটু ওঠানামা করছে দেখে বোঝা যায়, এখনো বেঁচে আছেন। আরো কতদিন বেঁচে থেকে এই সংসারটাকে একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবেন, কে জানে!

—মেয়েরা কোথায়?

—কেউ বাড়িতে নেই!

আমার মনে হলো, এরপর থেকে মেয়েরা কেউই আর কোনদিন সন্ধের সময় বাড়ি থাকবে না। তাদের ফিরতে রাত হবে।

—ছন্দাকে আমি যেখানে দেখা করতে বলেছিলাম, সেখানে গিয়েছিল?

—জানি না!

অর্থাৎ ছন্দা সেখানে যায়নি। ছন্দা কোন চাকরি পেলে সেকথা সে তার মাকে কি অন্তত জানাত না?

বিশাখা কাঠের মতন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মধ্যে একটা স্যাঁৎসেতে গন্ধ, মাঝে মাঝে জ্যাঠামশাইয়ের নিশ্বাসের একটা ঘড়ঘড় শব্দ।

ফুলবাগানের মোড় পেরোবার সময় বিশাখার মুখের এক পাশ দেখে ছন্দার কথা মনে পড়েছিল। কোথায় যেন একটু ছন্দার সঙ্গে মিল আছে। আমাদের বাড়ি গিয়ে ছন্দা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, আমি কীভাবে মরব, বলতে পারেন? আজ সন্ধ্যায় বিশাখার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সেই কথা মনে পড়েছিল। ছন্দাও একটি একুশ-বাইশ বছরের মেয়ে। সে কি বিশাখার মতন একটি সুন্দর জীবন পেতে পারত না?

রমেশ জ্যাঠার চোখ দেখেই বোঝা যায় তিনি বিশাখাকে চিনতে পেরেছেন। তার চোখের তারা দুটো ঘুরছে। তিনি কিছু বলতে চান। মালিকের মেয়ে সব কর্মচারীকে চেনে না, কিন্তু সব কর্মচারীই চেনে মালিকের মেয়েকে।

বিশাখা অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকাল। সে যেন একটি জালে-পড়া হরিণী। সে আমার কাছে উদ্ধার চাইছে। সে নিজেই এবার আমার এক হাত চেপে ধরল। কী কোমল, সুন্দর সেই হাত!

আমি ফিসফিস করে বললাম, পাঁচ মিনিটের জন্য আমি তোমাকে জীবনের অন্য একটা দিক দেখাতে নিয়ে এলাম। ইনি রোহিণী সিনেমা হলে কাজ করতেন। তুমি জানো কি, এঁরা দুশো একচল্লিশ দিন ধরে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। সেই

আটমাস এঁরা কেউ মাইনে পাননি। এখন ধর্মঘট মিটে গেছে অবশ্য, কিন্তু ইনি আর...

আমার কথাটা বেশ নাটকীয় শোনাল আমার নিজেরই কানে। এই ধরনের কাজ আমি নিজেও আগে করিনি। জ্যাঠামশাইয়ের চেহারাটা সত্যি অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। আমি নিজেই তাকিয়ে থাকতে পারছি না। এত দুঃখকষ্টের দৃশ্য আমি নিজেই সহ্য করতে পারি না, বিশাখার তো এরকম কিছুই দেখার অভ্যেস নেই। সে সহ্য করতে পারবে কেন?

সরমা জ্যাঠাইমা চোখ দিয়ে আমায় প্রশ্ন করলেন, মেয়েটি কে? আমি কাছে গিয়ে ফিসফিস করে ওর পরিচয় জানালাম। সরমা জ্যাঠাইমার চোখে খানিকটা কৌতূহল ফুটে উঠল, কিন্তু সেই কৌতূহলী চোখ নিয়ে তিনি বিশাখার বদলে আমার দিকেই তাকিয়ে রইলেন বেশিক্ষণ।

তারপর কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। মনে হলো, শুধু সেই ঘরটা নয়—সারা পৃথিবীই যেন এখন নিস্তব্ধ হয়ে আছে।

বিশাখার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে এল। ওর নরম মন। এই বীভৎস দৃশ্য সহ্য করতে পারবে কেন? তবু আমার মনে হলো, এই বিশ্রী নোংরা ঘরে অন্তত একজন সুখী মানুষের চোখের জলের প্রয়োজন ছিল!

আমি বিশাখার কাঁধে হাত ছুঁয়ে বললাম, চলো।

হঠাৎ বিশাখা ফুঁপিয়ে খুব জোরে কেঁদে উঠল। খাটটার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে প্রবল কান্নায় কেঁপে কেঁপে বলতে লাগল, আপনি আমার বাবাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। বাবা বুঝতে পারেননি। আপনি ক্ষমা করুন, আমি ক্ষমা চাইছি।

আমি জানি, জ্যাঠামশাই কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। তবু তিনি একটি হাত তোলার চেষ্টা করলেন, একটুখানি উঠেই হাতখানা ধপ করে পড়ে গেল।

রমেশ জ্যাঠামশাই বিশাখাকে আশীর্বাদ করতে চাইলেন, না অভিশাপ দিলেন, সেটা বুঝতে পারলাম না।